"বেশি-বেশি বই পড়ুন
আলোকিত জীবন গড়ুন"

আহসান কবির

গজালের চেয়ে আলপিন বড়

CONVERTED TO PDF

BY

---RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০১

দিব্য প্রকাশ

গজালের চেয়ে আলপিন বড়
আহসান কবির
©
বেগম কোহিনুর হক
প্রকাশক
দিব্য প্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
☎ ৭১২১৫৭৪
কম্পোজ
এডেপ্ট কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা
প্রচ্ছদ
শিশির ভট্টাচার্য
শেষ প্রচ্ছদ
বিপুল
অলংকরণ
শিশির ভট্টাচার্য, বিপুল, মুন্না ও কিশোরের
কার্টুন থেকে নেয়া হয়েছে
মূল্য : ৭০ টাকা

ISBN 984 483 089 3

উৎসর্গ

কবি-সাংবাদিক-রম্য লেখক

আনিসুল হক কে –

আনিস ভাই, ভুলে যাব
তাই মনে রাখার এতো আয়োজন।

সূচি

পুলিশ	৭
বিবাহ	১১
ক্যাডার	১৭
ভালবাসা মরে যায় মুগ্ধতা মরে না	২২
হ্যাপি লোড শেডিং টু ইউ	২৬
তেলের ফেরিওয়ালা	২৯
নিষিদ্ধ সংসদীয়	৩২
দোস্ত হয়ে গেল.......	৩৭
ইউ সি বি এল	৪২
রূপকথার রাজা	৪৭
বন থেকে দাতাল শুয়োর, রাজাসনে বসবেই!	৫০
স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভাঙার দিন	৫৫
দেবদূতের কবলে দুই নেত্রী	৬০
সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন সমগ্র পৃথিবী ক্লিনটন	৬৪
সরকার নিরাপত্তা আইন	৬৯
ধরে রাখা আর ধরা খাওয়ার বছর	৭৪
কষ্টে আছে আইজউদ্দীন, অপেক্ষায় নাজির	৭৭
ডিম পাড়া পড়া হুজুরের দরবারে	৮১
রাজনীতির শিশু শ্রমিক	৮৭
ক্ষমতাই সকল ভালোবাসার উৎস	৯২

লেখকের অন্যান্য বই

কষ্টে কষ্টে কষ্টি পাথর
(কাব্য গ্রন্থ-আসাদ আলম সিয়াম এর সাথে যুগ্মভাবে)

পু | লি | শ
পুরানে | লিখিত | শয়তান

পুরাণে লিখিত শয়তান?

আমার বন্ধু শাহ আলম। পুলিশে চাকরি করে। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল বাংলা অভিধানে 'পুলিশ' বানানটা কখনো খেয়াল করেছিস? আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম। শাহ আলম বলেছিল, অভিধানে দুরকম আছে পুলিশের বানান। একটি পুলিস, অন্যটি পুলিশ। কেন দুভাবে লেখা হয়েছে সেটার একটা বিশ্লেষণ দিয়েছে শাহ আলম। শাহ আলমের বাবা খুব সৎ পুলিশ অফিসার ছিলেন। ছোটকালে তার এমন সৎ পুলিশ হওয়ার ইচ্ছে ছিল । তখন সে ভাবতো 'পুলিস' মানে হচ্ছে পুরাণে লিখিত সন্ন্যাসী। শাহ আলম বর্তমানে পুলিশে চাকরি করছে। এখন সে মনে করে পুলিশ মানে 'পুরাণে লিখিত শয়তান'!

পুলিশের আরো অনেক পূর্ণরূপ পাওয়া যেতে পারে। রাস্তা-ঘাটে, হোটেল-রেস্তোরাঁয়, চায়ের টেবিলে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত 'পুলিশ'-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে পাজি লোচ্চা শয়তান। তবে শাহ আলমেরটাই আমার বেশি পছন্দ হয়েছে। শাহ আলম জানিয়েছে, পুরাণে ঈশ্বরের কথাও লেখা আছে। সেই ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। তবে এক ঈশ্বরকে সারা বিশ্বে দেখা যায়। এই ঈশ্বরের নাম 'টাকা পয়সা'। পুরাণে লিখিত শয়তানরা এই টাকা পয়সা নামের ঈশ্বরটাকে খুব ভালোভাবে চেনে। যে কোনোভাবেই হোক এই ঈশ্বরের দর্শন তারা পেতে চায়। হয়তো ২০ হাজার টাকা চেয়ে বসে। পেলে তো কথাই নেই। না পেলে টাকার অংক ২০ টাকাতেও নামিয়ে আনতে রাজি।

যদি সেটাও না মেলে?

বাংলাদেশের পুলিশ নাকি তবুও বলবে, 'এই ব্যাটা, পিঠটা একটু চুলকে দিয়ে তারপর যা!

এবং হিমু

পুলিশ দেখলেই হুমায়ূন আহমেদের হিমুর কথা মনে পড়ে। মাইট্রা পুলিশ (মেট্রোপলিটন পুলিশ), সাদা পুলিশ (সাদা পোশাকধারী ডিবি পুলিশ), হলুদ পুলিশ যার হাতেই দেখি বেনসনের প্যাকেট, মনে হয় হিমুর মতো জিজ্ঞেস করি দিনে কয় প্যাকেট ফোঁকেন?

পুলিশ হয়তো বলবে ধরুন দুই প্যাকেট। দুই প্যাকেট বেনসনের দাম ১৬০ টাকা। এক মাসের সিগারেট খরচ ৪৮০০ টাকা। একজন পুলিশের সেপাই, হাবিলদার, এএসআই বা এসআই কতো টাকা বেতন পান প্রতিমাসে? হিমুর মতো এই প্রশ্নটা আর জানতে চাওয়া হয়নি।

কিন্তু অন্যভাবে একটা জিনিস জানতে চেয়েছিলাম। টেম্পোতে উঠলেই মনে হতো, ড্রাইভারের পাশের সিটটা সম্ভবত পুলিশের জন্যই বরাদ্দকৃত। এই সিটে যে সমস্ত পুলিশ চড়েন তাদের ভাড়া দিতে দেখিনি কখনো। একদিন মোহাম্মদপুর থেকে ফার্মগেটে আসার সময় টেম্পোতে ড্রাইভারের পাশে যথারীতি এক পুলিশকে দেখলাম। টেম্পো থেকে নেমেই পুলিশ প্রবরকে বললাম, 'ভাই, ভাড়াটা দিয়ে যান।'

মহা অন্যায় করে ফেলেছি এমন একটা ভাব নিয়ে পুলিশ প্রবর আমাকে মাপলেন। তারপর পুলিশি হাসি দিয়েই বললেন, পুলিশকে ভাড়া দিতে দেখেছেন কখনো? পুলিশের কাছ থেকে ভাড়া নিলে নাকি বাহনের অমঙ্গল হয়। তবে আমি অন্যরকমের পুলিশ। আমি নিজের টেম্পোতেই চড়ে এসেছি। আমি এমন পাঁচটা টেম্পোর মালিক।

আমি সেদিন অবাক হয়েছিলাম। পরে অবশ্য এমন ভাবটা কেটে গিয়েছে। ঢাকা শহরের গার্মেন্টিস ব্যবসা থেকে শুরু করে অনেক ব্যবসাই নাকি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে পুলিশ কিংবা প্রাক্তন পুলিশরা। রাজধানীতে গত পনেরো বছরে গজিয়ে ওঠা দালানকোঠাগুলোর মালিকদের অনেকেই এক সময় পুলিশে চাকরি করতেন।

বেনসন, টেম্পো, বাড়ি কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক তারা কীভাবে হলেন? হিমুর মতো এই প্রশ্ন করতে ভয় লাগে ভীষণ। পকেটবিহীন কটকটে হলুদ লেডিজ পাঞ্জাবি পরা হিমুকে নেশাখোর ভেবে পুলিশ বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় বসিয়ে দিয়েছিল। হলুদ সর্ষের ফুল দেখেছিল হিমু। আমার মনে হয় পুলিশের কাছে কোনো প্রশ্ন জানতে চাইলে মাইট্টা কিংবা সাদা পুলিশরা তেড়ে আসবে ন্যূনতম সর্ষে ফুল দেখার ব্যবস্থা করতে।

খোজা-পুলিশ!

এক লোককে গ্রেপ্তার করতে এসেছে পুলিশ। অভিযোগ ওই লোকের কাছে জাল টাকা আছে। পুলিশ জাল টাকা খুঁজে পেলো না। তবে জাল টাকা বানানোর যন্ত্র পাওয়া গেলো। লোকটি গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য বললো, 'জাল টাকা তো নেই আমার কাছে'।

পুলিশ বললো, 'নেই তো কী হয়েছে, জাল টাকা বানানোর যন্ত্র পাওয়া গেছে।'

লোকটি বলেছিল, 'আপনাকেও তাহলে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা যায়।' কারণ ধর্ষণ না করলেও ধর্ষণের যন্ত্র তো পাওয়া যাবে আপনার কাছে।'

পুরোনো এই কৌতুকটি মনে করিয়ে দিয়েছিল আমার এক ছাত্র। কোচিঙে ক্লাস সেরে এই ছাত্রটি ঘরে ফিরতো রাত আটটার দিকে। একা একা। ক্লাস সিক্সে পড়ুয়া এই ছাত্রটির কাছে জানতে চেয়েছিলাম ঘরে ফিরতে তার অসুবিধা হয় না? ভয় লাগে না?

ছাত্রটি জানিয়েছিল তার বাবা থানার ওসি। যারা পথে অসুবিধা হয়ে দাঁড়াবে, সেই ছিনতাইকারী থেকে শুরু করে মাস্তান, রাজনীতিবিদসহ অনেককেই পাওয়া যায় তাদের বাসায়। তার বাবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে না এমন লোক নাকি এলাকাতেই নেই।

পুলিশদের সবচেয়ে বেশি কোথায় পাওয়ার আশা করা যেতে পারে? থানায়? সম্ভবত না। মাদকদ্রব্য বেচার আখড়া, ট্রাক, বাস, টেম্পো থেকে টাকা তোলার জন্য রাস্তার কোনো গলি-ঘুপচি কিংবা অপরাধ সংগঠনের যে কোনো স্পট থেকে সামান্য দূরেই এদের পাওয়া যায়। তবে কোনো দুর্ঘটনায় মানুষ যখন খুব বেশি আশা করে তখন পুলিশ আসার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। সিনেমায় নায়ক-ভিলেন যুদ্ধের পরই পুলিশের আগমন ঘটে। আর সিনেমায় অসৎ পুলিশ অফিসারের পাশাপাশি সৎ পুলিশ অফিসারদের দেখা মিললেও বাস্তবে সেটা নাকি মাইক্রোস্কোপ দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্ষণের যন্ত্র, মানুষকে ডাণ্ডাপেটা করা অথবা হত্যা করার অস্ত্র পুলিশের কাছে থাকা কতোটা নিরাপদ? এ ব্যাপারে একজন মানবাধিকার কর্মীর অভিমত হচ্ছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুলিশের কোনো বিকল্প নেই। তবুও ইয়াসমিন, সীমা রানীদের ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এসব মাথায় রেখেই বোধহয় প্রাচীনকালের রাজাবাদশারা যাদের আইন বা ইজ্জত রক্ষার কাজে নিয়োজিত রাখতেন, তাদের দশাশই শরীর দেখে সবাই ভড়কে যেতো, ভয় পেতো, কিন্তু তাদের কোনো অস্ত্রই থাকতো না। এ আইনরক্ষীকে সবাই 'খোজা' বলেই জানতো।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খোজা-পুলিশের ব্যাপারটা বোধহয় কল্পনাতেও আনা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

অনেক ছোট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। নিচের প্রশ্ন ও উত্তরগুলো তারা নির্দ্বিধায় সংগ্রহে রাখতে পারেন।

প্রশ্ন : চোর, বাটপাড়, ডাকাত, মাস্তানদের স্বর্গরাজ্য কতোটি আছে বাংলাদেশে?

উত্তর : বাংলাদেশে যতোগুলো পুলিশ স্টেশন আছে ঠিক ততোগুলো অর্থাৎ ৪৯০টি।

প্রশ্ন : মোল্লাদের যেমন ফতোয়া, পুলিশের তেমন কী?

উত্তর : অসৎ পথে উপার্জিত কাড়ি কাড়ি টাকা দিয়ে পুলিশেরা যতো সম্পত্তি গড়ে, তা লেখা থাকে তাদের বউদের নামে। পুলিশের বউদের তাই মনে হয় যেন মধ্যপ্রাচ্যের রাজা বাদশাহদের মেয়ে। তাদের জামাইরা তো জামাইয়ের রাজাই হবে।

প্রশ্ন : পুলিশের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কী?

উত্তর : পুলিশ সব সময় 'মৃদু লাঠিচার্জ' করে। পাবলিক সেটাকে ভাবে ভয়ঙ্কর ঠ্যাঙ্গানি।

প্রশ্ন : পুলিশ হতে পারার প্রধান তিনটি গুণ কী কী?

উত্তর : (১) পাবলিকের পকেটের টাকাকে নিজের টাকা মনে করা, (২) গালির অভিধানে হাফেজি পাস করা ও (৩) যখন-তখন যে কাউকে নিষ্ঠুর ঠ্যাঙ্গানি দিতে পারা।

রসাত্মক গল্প বলা

'বড় হইয়া তুমি কী হইতে চাও?' এই প্রশ্নের উত্তরে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা কখনো লেখে না যে তারা বড় হয়ে পুলিশ হতে চায়। এমনকি মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও

এমন বলে না। কিন্তু বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেয়া অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের পছন্দসই 'ক্যাডার' হিসেবে পুলিশ ক্যাডারকেই বেছে নেয়। বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি রসাত্মক গল্প বলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

সুন্দরবনে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনজন লোক এসে জড়ো হলো হিরণপয়েন্টে। এই তিনজন হচ্ছে আমেরিকা, ব্রিটেন ও বাংলাদেশের পুলিশ। হিরণ পয়েন্টে তাদের বলা হলো একটি হরিণ হারানো গিয়েছে। সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

আমেরিকার পুলিশ হারানো হরিণটিকে চারদিনে খুঁজে বের করলো। হরিণটি আবার ছেড়ে দেয়া হলো। ব্রিটেনের পুলিশ সেটাকে খুঁজে আনলো তিন দিনে। আবারো ছেড়ে দেয়া হলো হরিণটাকে। বাংলাদেশের পুলিশ হরিণটাকে কতোদিনে খুঁজে পাবে? রসাত্মক গল্পের ঢঙে এই প্রশ্নের সম্ভাব্য দুটি উত্তর :

(১) সন্দেহ জাগতে পারে সেটাই হারানো হরিণ কিনা। কিন্তু বাংলাদেশের পুলিশ চোখের পলকে হরিণ হাজির করে দিতে পারবে। কারণ হরিণ শিকার নিষিদ্ধ হলেও পুলিশ ভাইদের জন্য অবশ্য কোনো ব্যাপারই না। চাহিবামাত্র হরিণ জোগাড় করে ফেলবে।

(২) দুদিন পর গলায় দড়ি বাঁধা একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার হাজির করবে বাংলাদেশের পুলিশ। সবাই জানতে চাইবে, হারানো হরিণের বদলে কেন বাঘকে ধরে আনা হলো। বাংলাদেশের পুলিশ তখন মৃদু লাঠিচার্জ করবে অথবা বাঘকে রিমান্ডে নেবে। বাপ বাপ বলে তখন রয়েল বেঙ্গল টাইগার স্বীকার করবে যে সে বাঘ নয়, হারিয়ে যাওয়া হরিণ।

জীবন থেকে নেয়া

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা টিএসসিতে। প্রতীক্ষায় আছি। এমন সময় সে এসে তাড়াহুড়া করে বললো, 'শিগগিরই চলো।'

সে আমাকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নিয়ে এলো। আমি বললাম, 'এত জায়গা ফেলে শেষমেশ আমাকে নিয়ে এলে এই ঠোলাদের রাজ্যে?

আমার বান্ধবী প্রতিবাদ জানালো। বললো, ঠিক মতো কথা বলো। মানুষকে সম্মান জানাতে শেখো। কথাগুলো বলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের যেখানটায় পুলিশদের স্মৃতিস্তম্ভ আছে, সেখানটায় গিয়ে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকলো। আমার মনে হলো সে কাঁদছে।

ফেরার পথে আমার বান্ধবী বললো, ২৫ মার্চ কালো রাতে আমার বাবা তার বন্ধুদের সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেছিল। এই পুকুরগুলোর পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল বাবা ও তার বন্ধুদের। যখনই আমি এ পথ দিয়ে যাই বাবার জন্য আমার বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। আমার বুকটা তখন বাংলাদেশ হয়ে যায়।

আমার বান্ধবীর বাবার মতো পুলিশরা কেউ কি আজ আর বেঁচে নেই?

বি বা হ
বিশেষ বাসরে হরণ

সুখের গন্তব্য

মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ছোট মামা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তখনো বড় ও মেজ মামার বিয়ে হয়নি। পালিয়ে গিয়ে ওই বয়সে কেন হটহাট বিয়ে করলেন এই প্রশ্নের জবাবে ছোট মামা আমাকে বলেছিলেন, 'বিয়ে হচ্ছে দিল্লি কা লাড্ডু। খাও কিংবা না খাও ভাগিনা, পস্তানো থেকে বাঁচন নাই। তয় বুদ্ধিমান প্রাণীরা অতি দ্রুত খাইয়া পস্তানোকেই যুক্তিযুক্ত মনে করে।'

বিয়ের পাঁচ বছর পরেও মামা আমাকে এমন একটা যুক্তিযুক্ত কথা বলেছিলেন। একদিন মামার বাসায় গিয়েছি। যেয়ে দেখি ড্রইংরুমে মামার ছোট ছেলেটা কার্পেটে হিসি করার পর দুর্দান্তভাবে হাসাহাসি করছে। আঙুল কেটে ফেলেছে বলে বড় ছেলেটাকে নিয়ে মামা তখন ঘরের কাছের একটা ফার্মেসিতে গেছেন। মামী টয়লেটে। সেখান থেকে বেরিয়েই তিনি কান্নাকাটি শুরু করলেন। মামা ফিরে এলে মামী তাকে জানালেন, টয়লেট করার সময় তার হাতের মূল্যবান আংটিটা গিয়ে পড়েছে জায়গামতো। উদ্ধার করতে না পেরে মামার কাছে মামীর এমন শোককান্না (শোকে অভিভূত হওয়ার পর অভিযোগযুক্ত কান্না) দেখে মামা বললেন, বিয়ের পর প্রেম-ভালোবাসা-সুখ যেখানে লুকিয়েছে, আংটিটাও সেখানে গেলো। কী আর করা!

মামা এখন বলেন, ধরতে গেলে ছোটকালেই পালিয়ে বিয়ে করেছিলাম। আসলে বিয়ের জন্য মানুষ তখনই জান দিতে প্রস্তুত থাকে, যখন পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ধারণাই থাকে না আর পাত্রপাত্রীর মধ্যে মোহ থাকে আকাশ সমান।

ইদানীংকালের জনপ্রিয় ছবি হঠাৎ বৃষ্টির নায়িকা তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক সহনায়িকা, যে কিনা নায়ককে তার মতো পেতে চায়, সেই সহনায়িকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, ঈশ্বর মানব-মানবীর মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা স্বর্গেই করে থাকেন! হয়তো মানুষ স্বর্গে যাওয়ার (নাকি স্বর্গে থাকার) জন্যই বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের

পরে স্বামী স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে নরকের বাসিন্দা ভাবতেই বেশি ভালোবাসে। নিচের কয়েকটি লাইন খেয়াল করুন—

স্বামীর সঙ্গে রাগ করে ব্যাগ গুছিয়ে বাসা ছেড়ে যাচ্ছে স্ত্রী। স্বামী তার কাছে জানতে চাইলো, কোথায় যাচ্ছো?

স্ত্রী জানালো, সে নরকে যাচ্ছে।

স্বামী বিনয়ের সঙ্গে বলল, সেখানে যেয়ে তোমার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনকে আমার সালাম জানাতে যেন ভুলো না!

বিবাহিতদের জন্য ডিগ্রি

বুকের বাম পকেটে যার আছে বাহারি ডিগ্রির লিস্ট আর ব্যাংক যার কাছে শ্রেষ্ঠ উপাসনালয়, বিয়ের বাজার নাকি সে-ই মাত করতে পারে। তবে বিয়ের পরে অশিক্ষিত অনেকেই বাহারি ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে। নিচের গল্পটি পড়ুন—

সিলেটের কালু মিঞা ২০ বছর বয়সে লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছিলেন। স্কুল পাস করেননি কালু মিঞা। লন্ডনে যেয়ে এক ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করতেন। ১৫ বছর পরে লন্ডনে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। কালু মিঞা তার বন্ধুকে বাসায় নিয়ে গেল। তার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। বন্ধুটি দেখল বাসার দরোজায় নেমপ্লেটে লেখা আছে— 'কালু মিঞা এমও'। বন্ধুটি ভেবে পেল না কালু কবে ডাক্তারি পাস করল আর কবেই বা সে মেডিকেল অফিসার (এমও) হলো।

কিছুদিন পর কালুর স্ত্রী মারা গেল। তখন বাসার নেমপ্লেটে দেখা গেল অন্য ডিগ্রি। কালু মিঞা বিএ। কিছুদিন পর কালু মিঞা ফের বিয়ে করল। বাসার নেমপ্লেট বদলে গিয়ে হলো কালু মিঞা এমএ।

অবাক হয়ে একদিন এসব ডিগ্রির মানে জানতে চাইল কালু মিয়ার সেই বন্ধু। কালু মিঞা জানাল, প্রথম বিয়ের পর সে লিখেছিল এমও অর্থাৎ 'ম্যারিড অন্স'। প্রথম স্ত্রী মরে যাওয়ার পর সে লিখেছিল বিএ অর্থাৎ 'ব্যাচেলর অ্যাগেইন'। পুনর্বার বিয়ের পর সে লিখেছিল এমএ অর্থাৎ 'ম্যারিড অ্যাগেইন'।

কিছুদিন পর কালু মিঞা আত্মহত্যা করল। কালুর সেই বন্ধুটি ভেবেছিল, সে কালুর কবরে একটি 'এপিটাফ' লিখবে। ভাষা হবে এমন—বিএ ও এমএ করার পর এমফিল এবং পিএইচডি না করতে পারার দুঃখ নিয়ে কালু মিঞা এখানে ঘুমিয়ে আছে।

সেই বন্ধুটির কেন যেন আর এপিটাফ লেখা হয়নি।

বিশেষজ্ঞ বললেন...

আমি কলামিস্ট মাহবুব কামালের লেখার খুব ভক্ত। তিনি লিখেছিলেন, নিকৃষ্ট সংস্কৃতির পুরুষ সেই, যিনি একই সঙ্গে দুই স্ত্রীর ঘর করতে পারেন। মাহবুব কামালের আরো দুটি মন্তব্য এমন—

এক. মধ্যবিত্ত স্বামী স্ত্রীর কাছে যৌতুকের বায়না ধরে না, তবে কায়দা করিয়া বন্ধুমহলের যৌতুকপ্রাপ্তির গল্প শুনাইয়া দেয়।

দুই. পুরুষ দৈহিকভাবেই বহুগামিতার বীজ ধারণ করে—জীববৈজ্ঞানিক এই সত্যকে উচ্চবিত্ত ও বিত্তহীনের স্ত্রীগণ মানিয়া লইয়াছেন। মধ্যবিত্তের স্ত্রীগণ পারেন নাই।

একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করা এখন কেউই সহজে মেনে নিতে চায় না। তবে যিনি সাতটি বিয়ে করেছেন, তাকে আমার এক বন্ধু বলেছিল বিয়ে বিশেষজ্ঞ। বন্ধুটি সেই বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আমাকে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল। মাহবুব কামালের মতে, তিনি নিকৃষ্ট সংস্কৃতির মানুষ হতে পারেন, তবে সেই বিশেষজ্ঞ নিজেই একটি সাংস্কৃতিক দলের পরিচালক। সমাজসেবক হিসেবেও তার খ্যাতি আছে বেশ। বিশেষজ্ঞের সাত স্ত্রীর মধ্যে তিনজন তার সঙ্গে ঘর করছেন। সেই বিয়ে বিশেষজ্ঞ বলেছেন, একটি বিয়ে হচ্ছে প্রতিদিন গরম জলে স্নান করার মতো কিংবা ডাল-ভাত খাওয়ার মতো। গৃহপালিত এই অভ্যাসে একবার অভ্যস্ত হলে আর অসুবিধে হয় না। সাতটি বিয়ে করা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ বলেছেন, একজন বিবাহিত পুরুষ একজীবনে দুটি দিনকেই মনে রাখতে পারে। যেদিন সে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে কোলে তুলে বাসরে শোয়ায় আর যেদিন সে তার মৃত স্ত্রীকে হাতে করে কবরে নামায়। সাতটি বিয়ের কারণে, আমাকে হয়তো বিশেষ ১৪ দিনকে মনে রাখতে হবে। তবে আমি ৩৬৫ দিনকেই এভাবে মনে রাখতে চাই!

হুমায়ুন আজাদ আধুনিক নন?

মানুষ কেন বিয়ে করে? সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, একজন পুরুষ ও নারীর ভেতর সামাজিক শৃংখলার জন্য সবচেয়ে আধুনিক সম্পর্কের নাম বিবাহ। সামাজিক শৃংখলা রক্ষা, বংশবৃদ্ধি আর সুখী গৃহকোণ নির্মাণের মাধ্যমে সুখে-শান্তিতে বসবাসের জন্যই মানুষ বিয়ে করে।

কেউ যদি হুমায়ুন আজাদের *কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ* নামের উপন্যাস (নাকি কবি ও কবিয়াল বিষয়ক প্রবন্ধ?) পড়ে থাকেন, তবে তার ধারণা পাল্টে যেতে পারে। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, বিয়ে কখনো আধুনিক হতে পারে না। বিয়ের কাবিনকে যারা সোনালি কাবিন বলেন তারাও আধুনিক নন। হুমায়ুন আজাদের মতে পরকীয়া কিংবা লিভিং টুগেদার বিয়ের চেয়ে অনেক আধুনিক। হুমায়ুন আজাদ নিজে অবশ্য বিয়ে করেছেন, পরকীয়া কিংবা লিভিং টুগেদারের মতো ঘটনায় তিনি জড়িয়ে নেই বলে জানি। হায়! অসংখ্য বিবাহিত মানুষের মতো হুমায়ুন আজাদও কি আধুনিক নন?

বিয়ে পরীক্ষা

বিয়ে করার আগে যে কারো জন্য এই প্রশ্নের উত্তরগুলো ভালো করে জেনে নিয়ে বিয়ে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন : বি-বা-হ শব্দের পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : বিশেষ বাসরে হরণ।
প্রশ্ন : অবিবাহিতদের চেয়ে বিবাহিত পুরুষরা বেশি সাফল্য পান কেন?
উত্তর : সাফল্যের রাজপথে স্ত্রীরা দল বেঁধে তাদের স্বামীদের ঠেলে নিয়ে যান বলে।

প্রশ্ন : একজন সুখী স্বামীর পরিচয় দাও।

উত্তর : যে স্বামীর টাকা আছে, তিনি কানে যদি কম শোনেন আর কথা যদি কম বলেন, তাহলে তার সুখী হওয়ার সম্ভাবনা ১০০ ভাগ।

প্রশ্ন : কোনো স্ত্রীলোকই কেন বেশিদিন একজন পুরুষের বিবাহিত স্ত্রী হয়ে থাকতে পারেন না?

উত্তর : বিয়ের পর সব পুরুষই বদলে যায় বলে।

প্রশ্ন : স্ত্রীকে কি সব কথা বলা যাবে?

উত্তর : না, সেসব কথা বলা যেতে পারে যা সে (স্ত্রী) জানতে পারবে বা কেউ তাকে বলে দেবে।

ভাব সম্প্রসারন : বিয়ে হচ্ছে কাঁচির মতো। দুটি বিপরীতমুখী ধারালো ফলা এমনভাবে যুক্ত থাকে যেন ছাড়াছাড়ি হতে না পারে। ফলা দুটি চলে বিপরীত দিকে কিন্তু মাঝখানে যদি প্রেম, ভালোবাসা, সুখ অথবা অন্যকিছু পড়ে, তবে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে বাধ্য।

টীকা লিখ : তালাক, খোরপোশ, নিকাহ, যৌতুক ও পারিবারিক আদালত।

রচনা লিখ : (১) হলিউড তারকাদের বিবাহিত জীবন, (২) হিলারি ক্লিনটনের বিবাহিত জীবন, (৩) তোমার দেখা একটি বিয়ে কিংবা তালাক।

সাক্ষাৎকার

পঞ্চাশতম বিয়ে বার্ষিকীতে একজন সুখী স্বামীকে প্রশ্ন করছে অতিথিরা–

প্রশ্ন : কখনো স্ত্রীর সঙ্গে আপনার মতের অমিল হয়নি?

উত্তর : অসংখ্যবার হয়েছে। তবে আমি ভুলেও জানতে দেইনি।

অতিথির প্রশ্ন : কখনো বিয়ে বিচ্ছেদের কথা মনে হয়নি?

স্বামীর উত্তর : না, তবে বহুবার তাকে খুন করার তীব্র সাধ জেগেছে।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী সুন্দরী। আপনি তেমন সুদর্শন নন। আপনার স্ত্রী আপনাকে খোটা দেয়নি?

স্বামীর উত্তর : প্রথম প্রথম দিত। পরে সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার এমন কিছু স্বভাবের জন্যই সে আরো ভালো স্বামী পায়নি।

অতিথিদের শেষ প্রশ্ন : আপনার বউ আপনার কথামতোই চলবে–বিয়ের আগে বা পরে আপনি এমন চাননি?

স্বামীর উত্তর : রেল ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে যতই হর্ন বাজানো হোক এক্সপ্রেস ট্রেন কি তাতে কখনো থামবে?

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস ১৫ মে। সারা বিশ্বে স্বামী-স্ত্রীদের সুখীজীবন ও গৃহকোণ গড়ে তোলার কামনায় এ দিনটি পালিত হয়ে থাকে। সুখী গৃহকোণ কিন্তু রান্নাও করা যায়। বিশ্বাস না হয় নিচের রেসিপিটি খেয়াল করুন–

প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ :

৪ কাপ ভালোবাসা
২ কাপ আনুগত্য
২ কাপ বিশ্বাস
২ চা চামচ সহনশীলতা
১ কাপ দয়া
৫ কাপ সমঝোতা
৩ কাপ ক্ষমা
১ কাপ বন্ধুত্ব
৫ চা চামচ আশা
১ ব্যারেল হাসি-ঠাট্টা

রান্নার নিয়ম

বিশ্বাস ও আনুগত্যকে নিয়ে ভালোবাসার সঙ্গে ভালোভাবে মেশান। সহনশীলতা, দয়া, সমঝোতা ও ক্ষমাকে নিয়ে ওপরের মিশ্রিত তিন উপাদানের সঙ্গে অনর্গল ঘুঁটার পর ঘুঁটা দিতে থাকুন। ঘুঁটার পর ঘুঁটা দিতে থাকার মাঝে বন্ধুত্ব ও আশাকে এর ভেতর ছড়িয়ে দিন। এরপর এক ব্যারেল হাসি-ঠাট্টাকে এমনভাবে রাখুন, কোল্ড ড্রিংকসের বোতলে যেভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে আটকে রাখা হয় ঠিক সেভাবে। খাবার প্রস্তুত হলো। এবার পরিবেশন করুন ততটা যত্নের সঙ্গে–যাতে করে প্রতিদিন আপনার বাসর রাতের কথাটাই শুধু মনে পড়ে।

পুরস্কার

একাধিক নারীতে আসক্ত হলে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। একাধিক বিয়ে করে যারা তাদের বলা হচ্ছে নিকৃষ্ট সংস্কৃতির মানুষ। কিন্তু একটি মাত্র বিবাহের মাধ্যমে যারা জীবন পাড়ি দেয়, তাদেরকে অনেকে বলে থাকেন দাম্পত্য জীবনের মডেল। যারা বিয়ে না করে ধর্মপ্রচারের জন্য 'নান' বা 'ফাদার' হয়ে জীবন কাটিয়ে দেন, তাদের আরো বেশি সম্মানের চোখে দেখা হয়।

কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বিচারের জন্য এসেছে চার বিখ্যাত পুরুষ। হিটলার, মুসোলিনি, ক্লিনটন ও পোপ। ঈশ্বর হিটলারকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কজন নারীর সঙ্গে মিশেছো আর কজনকে বিয়ে করেছো?

হিটলার জানালো, ঈশ্বর নারীর সংখ্যা আমার জীবনে মাত্র একজনই। ঈশ্বর তাকে একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ উপহার দিলেন।

এরপর মুসোলিনি জানালো ঈশ্বরকে যে, বিয়ে মাত্র একবার করলেও আরো পাঁচ নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। ঈশ্বর মুসোলিনিকে একটি টয়োটা করোলা উপহার দিলেন।

ইন্টারনেটের কল্যাণে ক্লিনটনকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না ঈশ্বর, তাকে একটি টেম্পো উপহার দেওয়া হলো।

একদিন স্বর্গে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়লেন হিটলার, মুসোলিনি ও ক্লিনটন। উপহার হিসেবে পাওয়া যে যার গাড়ি নিয়ে ঘামছেন। হঠাৎ তারা দেখলেন ফুটপাত দিয়ে খুব ধীরগতিতে স্কেটিং করে পথ পাড়ি দিচ্ছেন আজীবন অবিবাহিত থাকা পোপ!

জীবন থেকে নেওয়া

এক.

ছেলেটি ভালো একটি চাকরি করত। দুর্ঘটনায় এক পা হারানোর পর দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকতে হলো। চাকরিটা থাকল না। একই সঙ্গে অন্য একজনকে বিয়ে করে বসল তার প্রেমিকা। ছেলেটি চাকরি পায়নি তারপরও। সাবেক প্রেমিকার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এক শীতের সকালে। প্রেমিকার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে অন্য এক সুদর্শন যুবক। তার ঘাড়ে ঝুলছে চামড়ার দামি জ্যাকেট।

ছেলেটির ইন্দোনেশিয়ার 'বিয়াক' উপজাতির যুবাদের কথা মনে পড়ল। মানুষের কাটা মুণ্ডু পিঠে ঝুলিয়ে পথ না হাঁটলে মেয়েরা তাদের ভালোবাসে না, বিয়ে করে না। ছেলেটি নিজের পঙ্গুত্ব আর বেকারত্বের ব্যর্থতা দেখতে পেল প্রেমিকার স্বামীর জ্যাকেটের ভেতর। তার মনে হলো, তার কাটা মুণ্ডুকে জ্যাকেট হিসেবে ঝুলিয়ে তার প্রেমিকাকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অন্য যুবক।

দুই.

সামরিক বাহিনীতে চাকরি করত আমার এক বন্ধু। কমিশন পাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলল সে। সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী আমার বন্ধুটি এ কাজ করতে পারে না। কিন্তু ঘটনাটি দ্রুত জানাজানি হয়ে গেল। সে সহসাই ডাক পেল তার ব্রিগেড কমান্ডারের।

ব্রিগেডিয়ার সাহেব তাকে পাথর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ইউ টিনি ব্লাডি ফুল, ইউ হ্যাভ অলরেডি ম্যারেড? (ছোট শুকর, তুমি যথারীতি বিয়ে করে ফেলেছ?)

আমার বন্ধুটি বলল 'ইয়েস স্যার'।

ব্রিগেডিয়ার সাহেব এবার গর্জে উঠে বললেন, হোয়াই ইউ হ্যাভ ম্যারেড? (তুমি কেন বিয়ে করেছ?)

আমার বন্ধুটি প্রায় হিসি করে দিতে দিতে বলল, ফর গড সেক স্যার, আই উইল নেভার ডু ইট এগেইন। (আল্লার কসম স্যার, এই ভুল আমি আর পুনর্বার করব না।)

ক্যা ডা র
ক্যারিশম্যাটিক ডাকাতদের রগড়

ছোটকালে রসায়ন বইতে পড়েছি সব ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নহে। আর একালে ক্যাডার শাস্ত্র পড়লে জানা যায়, সব ক্যাডারই সন্ত্রাসী তবে সকল সন্ত্রাসী ক্যাডার নহে। যে যুবক পিস্তল উচিয়ে এলিফেন্ট রোডের কোনো জুতোর দোকানের ক্যাশ বাক্সের পুরোটা আর গুটি কয়েক জুতো ছিনতাই করে নিয়ে আসে সে নিছক সন্ত্রাসী। অথচ যে সন্ত্রাসী পিস্তলটা কোমরে গুজে হোন্ডায় এসে থামে সেই জুতোর দোকানে, হোন্ডায় বসা অবস্থাতেই যার পায়ে পড়িয়ে দেয়া হয় নতুন জুতো, ভালো না লাগলে প্রতি ঘন্টায় যে এসে জুতো চেঞ্জ করে নিয়ে যায়, মাসোহারা পৌঁছে যায় নিয়মিত যার কাছে সেই ক্যাডার। সন্ত্রাস যে শিল্পে রূপান্তরিত করে সেই নাকি ক্যাডার। সন্ত্রাস, ছিনতাই, দখল কিংবা ডাকাতিকে যে ক্যারিশমার সঙ্গে জড়ায় সেই নাকি ক্যাডার।

সারা বিশ্বেই নাকি অতীত-বর্তমানে ক্যাডারদের জয়-জয়কার ছিল। হালাকু খান, চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান কিংবা হাল আমলের ওসামা বিন লাদেনরা সন্ত্রাসের শিল্পহীনতার জন্য সন্ত্রাসীই থেকে যান আর কোনো এক অজ্ঞাত ক্যারিশমায় কিনটন কিংবা সাদ্দামরা হয়ে যান বিখ্যাত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুই ক্যাডারের উপমা নাকি তারাই! এরশাদের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক ক্যাডারের যখন দোর্দণ্ড প্রতাপ, তখন নিয়মিত এলিফেন্ট রোডের অনেক ব্যবসায়ী তার কাছে 'মাসোহারা' পৌঁছে দিতে বাধ্য হতেন। বোমা বানাতে গিয়ে নিহত হবার আগে সেই ক্যাডার জিন্সের ফুলপ্যান্ট আর টিশার্ট পড়া তার আরো দশ পনের জন মিনি ক্যাডার (ক্যাডার পরিভাষায় সোলজার ফাইটার) নিয়ে একবার গিয়েছিলেন কেনাকাটা করতে। দোকানীরা জিনিস ভয়ে এমনি দিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। বিনীত ভঙ্গিতে সেই ক্যাডার বলেছিলেন আরে আপনার ব্যবসা না। বিনে পয়সা কেন নেবো। বখশিসসহ তিনি দাম ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ এই টাকা সেই ক্যাডার ওই দোকানীদের কাছ থেকে মাসোহারা হিসেবেই পেয়েছিলেন। এমন ক্যারিশমা না হলে নাকি ক্যাডার হওয়া যায় না। একজন অর্থনীতিবিদ সম্প্রতি লিখেছেন, চাঁদাবাজিকে বাজেটের আওতায় নিয়ে আসা উচিত। ভ্যাট বসানো উচিত। অন্যদিকে ক্যাডার অর্থাৎ ক্যারিশম্যাটিক

ডাকাতদের রগড় কাহিনী যখন আমাদের জীবনে ঈশপের গল্পের মতো স্থান করে নিয়েছে তখন ক্যাডার কার্যক্রমও পাঠ্যসূচির আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য তাই বাড়তি কিছু টিপস—

প্রশ্ন : ডাব পাকিলে নারকেল হয়, ক্যাডার পাকিলে?

উত্তর : এম.পি হইয়া সংসদে যায়।

প্রশ্ন : পুলিশ ও ক্যাডারদের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : একজন সরকারী ও অন্যজন বেসরকারি চাঁদাবাজ। পুলিশের তাই পোশাক আছে, ক্যাডারদের নেই।

প্রশ্ন : রপ্তানি ও ফেরারীর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : কোনো পণ্য চাহিদার বেশি উৎপন্ন হলে সেগুলো রপ্তানি হয়। আর কোনো ক্যাডারের উৎপাত বা ভয়ঙ্কর কার্যক্রম বেশি হয়ে গেলে তারা ফেরার হতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন : ক্যাডার শাস্ত্রের ওপর কোনো কোচিং সেন্টার খোলা কি লাভজনক?

উত্তর : মোটেই না। জন্মগতভাবেই নাকি এদেশের মানুষ ক্যাডার হবার বাসনা পোষণ করে। আর তাই এদেশে চিকিৎসা ক্যাডার, পুলিশ ক্যাডার, প্রকৌশল ও প্রশাসন ক্যাডার, কবিতা ক্যাডার এমনকি পতিতা ক্যাডারদেরও নাকি কোনো অভাব নেই।

ছোট ছোট শিশুরা খেলনা পাগল। আর এই খেলনা হিসেবে পিস্তল বন্দুকের জুড়ি নেই। খেলনা পিস্তল বন্দুক নিয়ে শিশুরা যখন বাবা-মাকে ভয় দেখায়, বাবা-মারা তখন কী ভাবেন? যে শিশু ছোটকালে গালাগালি খিস্তি-খেউর করে বড় হয়ে সে হবে সাংসদ। যে পিস্তল নিয়ে খেলে বড় হয়ে সে হবে সাদ্দাম? জেমস বন্ড, র‍্যাম্বো, কমান্ডো কিংবা নিদেন পক্ষে মাসুদ রানা! বাবা-মারা হয়তো প্রার্থনায় 'কামান'-ই চাইবেন। বাস্তবে যদি কামানের পরিবর্তে পিস্তল-ই মেলে তবে তাদের ছেলে মেয়েদের ক্যাডার হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশ ভাগ। আর ক্যাডার হলে তাদের কিছু ক্যারিশম্যাটিক নাম থাকবেই। প্রিয় পাঠক, নীচের নামগুলো খেয়াল করুন :

ছিঁড়া আকবর

এরশাদ ক্ষমতায় আসার পরে গালকাটা কামালের ফাঁসি হয়েছিল। আদমজী এলকায় এখনও একজন আছেন যিনি গলাকাটা কাসেম নামে পরিচিত। আসলে টাক মাথা, খোঁড়া, বেঁটে, চিকন, ছোটখাটো গড়ন, মোবাইল বহনকারী, ক্যাপ পরা যুবক, ক্যাডার *যেই হোক না কেন বিচিত্র নাম থেকে কারো হয়তো রক্ষা নেই। তবে সবচেয়ে* অবিচারের মুখোমুখি হয় 'বাবু' নামের ক্যাডাররা। মাত্র কয়েক দিন হলো নারিন্দা ক্লাব থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বাবু নামে এক টপ টেরর। জানা গেছে, তার তিনটি নাম আছে—মিরপুইর‍্যা বাবু, পিচ্চি বাবু আর বিএনপি বাবু। বোমা বানাতে গিয়ে হাত-পা ঝলসে গেছে এমন এক ক্যাডারের নাম 'বোমা বাবু' বাম হাত দিয়ে বাঁ হাতি ক্রিকেটারের মতো অস্ত্র চালানোর জন্য ঢাকা ভার্সিটির এক পরিচিত ক্যাডারের নাম

ছিলো 'ন্যাটা বাবু'। ঘোলা চোখ থাকার কারণে জিগাতলার একজনের নাম 'বিলাই বাবু'। ঢাকা ভর্সিটির এক ক্যাডারের নাম 'বাটাম বাবু'। মাথায় ছিট থাকার কারণে একজনের নাম হয়ে গেলে 'ছিট বাবু'। এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর প্যালেস্টাইন যাওয়া এবং পরে ফিরে আসার কারণে এক ক্যাডার নেতার নাম ছিল 'প্যালেস্টাইন বাবু'। তেমনি আছে 'জাপানি বাবু' কিংবা 'হোয়াইট বাবু'। কুকুর পালা এবং সেটা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কারণে মালিবাগের একজনের নাম ছিল 'কুত্তা বাবু'। ওবায়দুল হক বাবুল হত্যা মামলার আসামি 'জাসদ বাবু'।

তবে কাঁটাবন মার্কেট থেকে জোর করে একটি বিদেশী কুকুর ছিনিয়ে আনা আর সেটা নিয়ে ক্লাস করতে যাওয়ার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একজনের নাম ছিল ডগ শিশির। আর ভাব ধরা বা মুড মারার কারণে একই নামের অন্য এক ক্যাডারের খেতাব ছিল 'ভাব শিশির'। খুব বেশি ভাত খাওয়া এবং চানখাঁর পুলের হোটেলগুলোতে খেয়ে পয়সা না দেয়ার কারণে একজনের নাম হয়ে গেল 'ভেতো শাহিন'। এ রকম সর্বক্ষণ ক্যাপ পরে থাকার কারণে 'ক্যাপ সোহেল'। সোহেল নামের আর একজনের পরিচিতি ছিল 'ফ্রিডম সোহেল'। মোবাইল হাতে মুড দেখানোর কারণে নাম হয়ে যায় কারো 'মোবাইল মহসিন'। মুরগির ব্যবসার কারণে নাম 'মুরগি মিলন'। সোনা চোরাচালান বা ব্যবসায় জড়িত থাকার কারণে চট্টগ্রামের বিখ্যাত একজনের নাম 'সোনা রফিক'। কাটা রাইফেল নিয়ে ঘোরাঘুরির কারণে কেউ হয়ে যায় 'কাটা বাদল'। একই নামের দুজন থাকাতে একজনের পরিচিতি হয় ধলা বা সাদা সেন্টু আর অন্যজন কালা সেন্টু। কোর্ট বিল্ডিঙে হত্যার দায়ে পুলিশ যাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে তার নাম 'কালা জাহাঙ্গীর'। একদা সুইডেন থাকার কারণে ঢাকা শহরের বিখ্যাত এক টপ টেররের নাম 'সুইডেন আসলাম'। ক্যাম্পাসের হল দখলকারী এক কুখ্যাত টোকাই ক্যাডারের নাম 'টোকাই মিজান'। এতিমখানায় পড়ালেখার কারণে কারো নাম 'এতিম রাশেদ'। খুলনার এক ক্যাডারের নাম 'গুটগুটে বারেক'।

ইদানিং চট্টগ্রামে ধরা পড়া এক ক্যাডার সন্ত্রাসীর নাম পুলিশ জানিয়েছে 'ছিঁড়া আকবর'। তার মাথার তার ছেঁড়া নাকি অন্য কিছু ছেঁড়াতে সে এক্সপার্ট পুলিশ তা জানাতে পারেনি। তবে ভালোবাসার জন্য ক্যাডারদের মাথার তার নাকি সব সময় একটু বেশিই ছেঁড়া থাকে!

ডাইল ভালোবাসা

ক্যাডারদের একটি প্রিয় বিষয় 'বাধ্য করা'। তারা চাঁদা দিতে বাধ্য করে, দখল করা হলের রুম ছেড়ে দিতে বাধ্য করে, ডাইনিং, ক্যান্টিনে খাবার ফ্রি দিতে বাধ্য করে। জোর করে এরাই যদি কোনো মেয়েকে মন দিতে বাধ্য করে তবে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই।

৩১ মে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে ক্রিকেট খেলায় হারিয়ে দেয়ার পর রং ছিটানোর উৎসবে মেতে উঠেছিল অনেকেই। ক্যাম্পাসে ক্যাডাররা এ সময় অনেক ছাত্রীর গায়ে রং মাখিয়ে দিয়েছিল। এক ছাত্রীকে ক্যাডাররা রং মাখিয়ে দেয়ার সময় তার সামনে

অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ছাত্রীর ছাত্র-প্রেমিকের খেদোক্তি ছিল 'তিন বছর প্রেম করেও ওকে ছুঁয়ে দেখিনি। অথচ আপনারা ওর গালে নিপুণ ভঙ্গিতে রং মাখিয়ে দিলেন। আপনাদের মতো ক্যাডার রংবাজ হওয়াই তাহলে ভালো ছিল।'

এরশাদের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বেশ দাপট ছিল। তখন ছাত্রদলের সবচেয়ে প্রভাবশালী এক ক্যাডার হোন্ডার পেছনে যখন তার প্রেমিকাকে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটতো তখন নাকি কেউ কেউ বলতো ওই দেখ ক্যাম্পাসের ফার্স্ট লেডি যাচ্ছে।

বাধ্য করুক আর অন্য যেভাবেই ম্যানেজ করুক ক্যাডারদের 'ভালোবাসা' ভাগ্য ঈর্ষণীয়। একেবারে এরশাদ বা আজিজ মোহাম্মদ ভাই-এর মতো। কারণ হিসেবে কি বলা যাবে যে নারীদের এক সময় 'বীরভোগ্যা রমণী' বলা হতো এটা তার প্রভাব? সিনেমার নায়কদের ক্যাডারসুলভ গুণ না থাকলে নাকি তিনি জনপ্রিয় হন না। র‍্যাম্বো কিংবা কমান্ডো অথবা মাসুদ রানার জনপ্রিয় হওয়ার কারণ নাকি এই ক্যাডারসুলভ গুণাগুণ! তাদের নাকি তাই নায়িকার অভাব হয় না।

বর্তমানে ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসের এক বিখ্যাত ক্যাডার সুনীলের কেউ কথা রাখেনি কবিতার অংশবিশেষ : (বরুনার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি/দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়/বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টি নীলপদ্ম...) শুনিয়ে বলেছে এমন ভালোবাসার নজির নাকি শুধু ক্যাডাররাই রাখতে পারে। কবিতাটি শুনে নাকি তেমনই মনে হয়!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেসব ক্যাডার শহীদ হয়েছে তাদের প্রেমিকা বা স্ত্রী ছিল। হাল আমলের এক ক্যাডার 'ডাইল' খেতে গিয়ে তার পরিচয় হয়েছিল ডাইলে আসক্ত এক ছাত্রীর প্রতি। এক সময়ে জমে উঠেছিল তাদের প্রেম। এই ডাইল প্রেমিকদ্বয়কে ক্যাডাররা দুই লাইন কবিতা উৎসর্গ করেছে—

তোমার আমার মনের মিল—ফেনসিডিল ফেনসিডিল!

আপ্যায়ন

বরিশাল বিএম কলেজ ক্যাম্পাস। সেখানকার এক নামী ক্যাডারের কাছে ঢাকা থেকে তিনচার ক্যাডার বেড়াতে গিয়েছে। মিনারেল ওয়াটার হাতের কাছে নেই বলে বিএম কলেজের সেই হোস্ট ক্যাডার গেস্টদের নিয়ে গেলো কলেজের প্রিন্সিপাল বাংলোর কাছে। সমানে ডাব পাড়ানো শুরু করলো সে।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল ও কয়েকজন গার্ড। তারা এসে ঘিরে ফেললো গেস্ট ক্যাডারদের। হোস্ট ক্যাডার তখন সদম্ভে বললো, 'ওগো ছাইড়া দেন স্যার। ওরা মোর গেস্ট!'

ডাব দেখে প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল একটু থমকে গেলেন। ভাইস প্রিন্সিপাল একটু নরম গলায় বললেন, বোকা, দুএকটা ডাব যদি খেতেই হয় তবে তো রাতের বেলা অনেকের চোখের আড়ালে খেলেই পারো।

হোস্ট ক্যাডার বেশ সদম্ভেই বললো, স্যার মোরে কি চুরি হরতে (করতে) কন?

ভাইস প্রিন্সিপাল তখন রেগেমেগেই বললেন, 'এইডা হেইলে কী করতে আছে লা?' হোস্ট ক্যাডারের উত্তর ছিল : এইডা স্যার ডাহাতি। মানি লোহের (লোক) কাম ডাহাতি হরন, চুরি না!

ক্যারিশম্যাটিক ডাকাতদের রগড়

গলির মুখে যে ছেলেটি ক্র্যাচ হাতে নিয়ে এখন মুদি দোকানের সামনের বেঞ্চটায় বসে থাকে সে আমাদের অনেকেরই ছোটকালের বন্ধু সুজন। যখন তখন জোকারি করা আর অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তার জন্য সে আমাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। অথচ কলেজে উঠেই বখে গেলো সে। আমরা জানলাম তার নাম হয়েছে ক্যাডার সুজন। বড় বাজারের কোনো দোকানির সামনে সে পিস্তল উঁচিয়ে বলতো, 'দেন তো আট আনা!' দোকানি ভয়ে ভয়ে বলতো, 'মাত্র আট আনা!'

সুজন ঝাড়ি মেরে তখন বলতো আধুলি ডা দিয়া টচ কইরা দেহি কি নেওন যায়, ক্যাশবাক্সের সব নাকি তোর বাপের দেওয়া জানডা।

একবার পুলিশের হাত থেকে পালানোর সময় নিজের পকেটে রাখা পিস্তলের গুলিতে সুজনের নিম্নাঙ্গ ঝাজরা হয়ে যায়।

যমে-ডাক্তারে টানাটানি আর অনেকদিন জেলের ভাত খাবার পর পঙ্গু হয়ে সে এখন গলির মুখেই ক্র্যাচ হাতে বসে থাকে। জোকারি করে বলে, 'বাপের দেয়া জানডা বাঁচছে। গুলিতে শ্বশুড় মিঞার মেয়ের সম্পত্তিটা হাতছাড়া হইছে।'

সুজনের একটা কথা আমার প্রায় মনে পড়ে। ও বলতো, জানিস বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুই ক্যাডার কারা? এদেশের দুজন সামরিক শাসক! বন্দুকের জোরে হল দখল, চর দখলের মত তারা দেশ দখল করেছিল।

গলির মুখে সুজন এখন মন খারাপ করে বসে থাকে। দুঃখ করে বলে—বাস্তবতা এমন— ভালো ছাত্র, ভালো গায়ক, ভালো খেলোয়াড়কে ক্যাম্পাসের কেউ মনে রাখে না, আমল করে না। সমঝে চলে ক্যাডারদেরই। অথচ এই সুজনকে এখন আড়ালে আবডালে সবাই বলে 'লুলা সুজন'। ক্যাডার মরলেও লাখ টাকা। বিএনপির আমলে ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে এক ক্যাডার নিহত হলে তার লাশ দাফন করার জন্য হেলিকপ্টারে করে পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো। মনে হয় এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো ছিল।

ভালো মন্দ খাবার জন্য মাত্র বিশটা টাকা ধার চেয়ে আমার কাছ থেকে টাকা পাওয়ার পর প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠে সুজন বলেছিল—ক্যাডার পাকলে এমপি হয়, কিন্তু ক্যাডার পঁচলে কী হয় জানিস?

আমি উত্তর দিতে পারিনি। মুদি দোকানটার পাশে জিভ বের করে রোদ পোহাচ্ছে এক কুকুর। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার জিভ লক লক করে নড়ছে। একটু দূরেই ডাস্টবিন। মাছি উড়ছে গন্ধ ছুটছে। আমি জোরে হাটা শুরু করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলের এক পঙ্গু ভিপির কথা আমার মনে পড়ছে। আমি সুজনের উত্তরটা না শোনার জন্য জোরে জোরে হাঁটছি। ডাস্টবিনটা পেরুনোর সময় আমার মনে হলো ক্যাডার পঁচলে কী হয় সুজনের কাছ থেকে সেটা আমার না জানলেও চলবে।

ভালোবাসা মরে যায়
মুগ্ধতা মরে না

হেলেনের জন্য ট্রয়,
মনিকার জন্য বাগদাদ

সম্রাট শাহজাহানকে অনেক ইতিহাসবিদ ভালো প্রেমিক মনে করতেন না। তাদের ধারণা এমন, যে সম্রাট তার বোনের প্রেমিককে পানিতে চুবিয়ে মারতে পারেন তিনি কী করে একজন ভালো প্রেমিক হন? প্রেমের তীর্থ হিসেবে তাজমহল দেখতে যাওয়া কি তাহলে অর্থের অপচয়? এমন অপচয় মানুষ আজকাল হরহামেশাই করে। ব্যান্ড গায়ক মাকসুদের মতে গান এখন শুধু শোনার ব্যাপারই না, দেখারও ব্যাপার। ঠিক তেমনি ভালোবাসা এখন শুধু অনুভবের ব্যাপার না, ঘন ঘন দর্শন (সেঞ্চুরিয়ান মানিকের মতো শুরুতেই ধর্ষণ নয়) ও উত্তেজিত হওয়ারও ব্যাপার। মানুষ আজকাল তাই প্রেম শিখতে সিনেমা হলে যায়। প্রেমের ছবির নায়করা সম্রাট শাহজাহানের মতো ভিলেনদের পানিতে চুবিয়ে কিংবা ডিসুম ডিসুম করে মেরে ফেলে। আর দর্শকও হাততালি দিয়ে সিনেমা হল ফাটায়। হয়তো একারণেই কবি হেলাল হাফিজ লিখেছিলেন, 'কিছু কিছু প্রেম আছে, প্রেমিককে খুনি হতে হয়!' অতীতে দুই বীরের মধ্যে লড়াই হতো। যে জিততো সেই পেতো রাজত্ব আর রাজকুমারী। তাই এখনো আমরা খুনি প্রেমিকের পক্ষেই থাকি। মনিকার জন্য বাগদাদে বোমা ফেলে মানুষ মারেন ক্লিনটন। কার সাধ্য আছে পৃথিবীর বড়ো খুনিদের (?) একজন ক্লিনটনকে পুরোপুরি ঘৃণা করে? কিন্তু খুনি হিসেবে যে সফল নয়, দুঃখবোধ, করুণা কিংবা ঘৃণা আমরা তার জন্যই তুলে রাখি!

পার্বতীকে বড়শির ডাণ্ডা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল দেবদাস, তবুও তার জন্য আমাদের দুঃখই হয়। নায়িকা জুডি ফস্টারের মনে ধরার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যানকে গুলি ছুড়েছিল জন হিংকলে। সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলেন রিগ্যান। অসফল খুনি জন হিংকলেকে যুক্তরাষ্ট্র একরকম করুণাই করেছে। উন্মাদ ভেবে তাকে পাঠিয়েছিল পাগলাগারদে। আর প্রেমিকাকে না পেয়ে যে উন্মাদ প্রেমিক তার গায়ে এসিড ছুড়ে মারে সেই নরপশুদের আমরা ঘৃণাই করি।

প্রেমের জন্য এই খুনোখুনি মনে হয় চলতেই থাকবে। হেলেনদের জন্য আগে ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়ে যেতো, মনিকাদের জন্য এখন বাগদাদ ধ্বংস হবে। তাই কবি হেলাল হাফিজও লিখতে থাকবেন-ভালোবেসে কেউ যদি খুনি হতে চান, তবে তাই হয়ে যান-প্রকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়...।

এক চিমটি আঁতলামি

ভালোবাসা হচ্ছে ভালোলাগা বোধের এক তীব্র ঝাঁকুনি। ঝাঁকুনি খুব বেশি সময় ধরে চললে সেটা ভালোবাসা। আর ভালোবাসার আরাধ্যকে পাওয়ার জন্য যে সাধনা, সেটা প্রেম। প্রেমের অকাট্য কোনো সংজ্ঞা নেই বলে আরো অনেক সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে। যেমন কলামিস্ট মাহবুব কামালের মতে, 'প্রেম হচ্ছে শিল্পিত মিথ্যা'। কারো কারো মতে প্রেম একটি পবিত্র অভ্যাস। যে যাই বলুক, চাপাবাজরা ভালো প্রেমিক হতে পারে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। তবে বাস্তবতা বলে প্রেম নির্ভর করে আজকাল শুধু 'ফিগার'-এর ওপর। মেয়েদের জন্য যেমন চেহারা ও ফিগার ছেলেদের জন্য তেমন ব্যাংক বা পকেটের ফিগার। ইহকাল ও পরকালের জন্য মানুষ এই একটি মাত্র অব্যর্থ অ্যান্টিবায়োটিকই তৈরি করতে শিখেছে। পরকালের জন্য তোলা থাকে ঈশ্বর-প্রেম, যাকে আমরা ধর্ম বলেই বেশি চিনি আর ইহকালের পুরোটা সময় ধরে চলে মানব-মানবীর প্রেম নিয়ে সাধনা।

'বাবুই' ভালোবাসা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করুন। একবিংশ শতাব্দীর ভালোবাসা কেমন হবে? মানুষ তখন যদি পাখিদের দিয়ে ভালোবাসা বিচার করে তবে মন্দ হবে না। গত বিশটা শতাব্দী আমাদের ভালোবাসা কেমন ছিল? উত্তর হবে ময়ূরদের মতো ছিল। প্রজননকালে ময়ূরীর ডাকে ছুটে আসে একাধিক ময়ূর। শুরু হয় লড়াই। ময়ূরী বেছে নেয় সেই লড়াইজয়ী বীর ময়ূরকেই। এমন নিয়মের জন্য নারীদের বলা হতো বীরভোগ্যা রমণী! আগামী শতাব্দীতে কোনো প্রেমিক যখন শুনবে তার প্রেমিকা তাকে চড়ুই পাখির মতো ভালোবাসে তখন সে কেঁদে ফেলবে। পুরুষ চড়ুই মরে গেলে স্ত্রী চড়ুই খুব অল্প সময়ের ভেতরেই নতুন সঙ্গী বেছে নেয়। চড়ুইয়ের মতো প্রেম কোনো প্রেমিকের কাম্য হবে না। তারা আশায় থাকবে প্রেমিকারা তাদের সারস পাখির মতো ভালোবাসবে। পুরুষ সারস মারা গেলে স্ত্রী সারস আর কখনই পুরুষ সঙ্গী বেছে নিতে চায় না। কিন্তু প্রেমিকদের সারস ভালোবাসার আশা খুব একটা পূরণ হবে বলে মনে হয় না। কারণ এ শতাব্দীতেই বিদ্যাসাগররা বিধবা বিবাহের (নাকি ভালেবাসার?) প্রচলন করে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য সারসরা এটা জানতে পারেনি।

তবে এ শতাব্দীর মতো আগামী শতাব্দীতেও বাবুই ভালোবাসা ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা লাভ করবে। স্ত্রী বাবুই নজরকাড়া বাসা গড়তে পারে না, পুরুষ বাবুই পারে। এ সুযোগটাই তারা নেয়। বাসা গড়ে। প্রজননকালে আহ্বান করে পছন্দ মতো দুতিনজনকে। তারপর উড়াল দেয়। নতুন বাসা বানিয়ে আবারও মিলনের ডাক ডাকে। বিস্তর সাড়াও পায়। প্রেমিকদের কাছে বাবুই ভালোবাসাও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

রাজনীতির ভালোবাসা

রাজা অষ্টম অ্যাডওয়ার্ড প্রেমের জন্য সিংহাসন ছেড়েছিলেন। ধ্রুপদী প্রেমের উদাহরণ হয়ে আছে সেই ঘটনা। শতাব্দীর শেষে এসে মনিকার জন্য হয়তো ক্লিনটনকে সিংহাসনও হারাতে হতে পারে তবে তাদের প্রেম কেমন ছিল তার উত্তর হিলারিই ভালো দিতে পারবেন। ক্লিনটনকে খুব বেশি মূল্য দিতে হলো। আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদকেও কিন্তু কম মূল্য দিতে হয়নি। তবে ক্লিনটন যা পারেননি এরশাদ তা পেরেছেন। জাতীয় পার্টি ভাঙার শুরুতেই তিনি জিনাতকে দেয়া মূল্যবান জিপটি

ফেরত এনেছেন। তিনি সিংহাসনও ফেরত পেতে চান। কিন্তু ভালোবাসায় রাজনীতি আর অর্থনীতি কঠিনভাবে জড়িয়ে পড়লে কেমন হবে?

ধরা যাক, তুনাবী নামের মেয়েটি মুনাদ নামের ছেলেটির সঙ্গে প্রেম করতো। একদিন দেখা গেলো, তুনাবী মুনাদকে ছেড়ে ধনাঢ্য এক ব্যবসায়ী শুভর প্রেমে পড়েছে। তুনাবী আর শুভকে পাশাপাশি দেখলে কেমন লাগবে? প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বলা হবে, একদা ইফতার পার্টিতে পাশাপাশি বসে থাকা সাদেক হোসেন খোকা আর মেয়র মোহাম্মদ হানিফকে যেমন লাগতো। তুনাবী কেন শুভর কাছে ধরনা দিলো? উত্তরে হয়তো বলা হবে, যে কারণে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের কাছে ধরণা দেন! হয়তো একদিন তুনাবী মুনাদের কাছেই ফিরে এল। তাদের আবার একসঙ্গে পথচলা শুরু হলো। তখন হয়তো বলা হবে দল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসা কাজী জাফরকে এরশাদের পাশে যেমন লাগতো, মুনাদ আর তুনাবীকেও এখন তেমন লাগছে। লাভক্ষতি কিংবা হার-জিতের প্রশ্ন পরে— প্রিয় পাঠক, আসুন প্রার্থনা করি তুনাবী আর মুনাদের যেন বিয়ে হয়। মানুষ যেন বলতে পারে মুনাদ এখন তুনাবীকে সেই উষ্ণতায় জড়িয়ে রেখেছে, যে উষ্ণতায় মেয়র নির্বাচনে হারার পরও মির্জা আব্বাস মোহাম্মদ হানিফকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছিলেন!

গল্প

ডিম আগে না মুরগি আগে এমন একটা বিতর্ক প্রেমকে ঘিরেও আছে। সেটা হচ্ছে ভালোবাসায় মন আগে না শরীর আগে। বিতর্কে না জড়িয়ে বর্তমান সময়ের উপযোগী দুটি গল্প শোনা যাক। প্রথমটি প্লেটনিক গল্প । এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে সংসদ ভবনের লেকে নৌকায় চড়ছে। প্রেমিকা সাঁতার জানে না। প্রেমিকের ধারণা নৌকা উল্টে গেলেও ক্ষতি নেই। প্রেমের মরা তো জলে ডোবে না। নৌকার দুলুনিতে প্রেমিকা লেকের জলে ডুবেই গেলো। প্রেমিকের সে কী কান্না। একেবারে মিরপুরের এস এ খালেকের মতো। হঠাৎ জল থেকে ভুস করে মাথা বের করলো জলদেবতা। লেডি ডায়নাকে দেখিয়ে বললো, এ কি তোমার প্রেমিকা? প্রেমিক কান্না সামলে ভয়ে ভয়ে বললো, হ্যাঁ। আমি তাকেই নেবো।

জলদেবতার মন খারাপ হয়ে গেলো। মানুষ কি এতটাই পাল্টে গেছে! তিনি বললেন, আগে এক কাঠুরিয়া তার কুঠারটি হারিয়েছিল এখানে। আমি তাকে প্রথমে সোনার, পরে রুপার কুঠার দেখিয়েছিলাম। সে সত্যি বলেছিল যে দুটি কুঠারের কোনোটাই তার নয়। পরে তার আসল কুঠারটিসহ তিনটি কুঠারই আমি তাকে উপহার দিয়েছিলাম। মানুষরা এ গল্প জানে। তুমি সত্যি বললে আমি তোমাকে লেডি ডায়না, মাধুরী দীক্ষিত আর তোমার আসল প্রেমিকা এই তিনজনকেই তোমাকে দিতাম। প্রেমিক তখন স্বাভাবিকভাবেই বলে ফেললো, জলদেবতা আপনি এ যুগের দেবতা নন। তাই আপনি জানেন না, এক সঙ্গে এমন প্রেমিকা থাকা আজকাল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মোটেও 'ফিজিবল' না।

দ্বিতীয় গল্পটি ফ্রয়েডীয়। একজন ডাক্তার। প্রেম-ভালোবাসা বিবাহ নিয়ে কাজ করে অনাবিল সাফল্য পেয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন এক ভয়ঙ্কর ইনজেকশন। দিলেই সাতদিন শরীরে অসম্ভব বেদনা হয়। কিন্তু সাতদিন পরেই উপসর্গ দূর হয়। ভাঙা প্রেম জোড়া লাগে। হালকা প্রেম ঘন হয়। দাম্পত্য-জীবনে স্বর্গসুখ আসে। এমন ডাক্তারের কাছে তিন প্রেমিক রোগী এসেছে। একজন ব্রিটিশ, দ্বিতীয় জন আমেরিকান, তৃতীয় জন এক বুনো আফ্রিকান।

আমেরিকানটি ব্রিটিশ রোগীর কাছে জানতে চাইলো, তুমি কেন এসেছো?

ব্রিটিশ জানালো, সে খুব বেশি কথা বলে। তার এই বক বক স্বভাব কমাতে তার প্রেমিকা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। হাই ইয়াংকি, তুমি কেন এখানে এসেছো?

আমেরিকানটি জানালো, চুমু খুব পছন্দ তার প্রেমিকার। কিন্তু সে চুমুর বদলে শুধু কামড় দিতে ভালোবাসে। তাই তার প্রেমিকা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

এবার তারা দুজন বুনো আফ্রিকানের কাছে জানতে চাইলো, সে কেন এসেছে। বুনো আফ্রিকান বলতে শুরু করলো—প্রেমিকার চেয়ে তার বান্ধবীরাই আমার কাছে প্রিয় ছিল। গতকাল আমার প্রেমিকা একটি পাঁচতারা হোটেলের সুইমিংপুলে তার বান্ধবীসহ সাঁতার কাটছিল। আমি চোখের নিমিষে হোটেলের একটি রুম ভাড়া করে প্রেমিকার বান্ধবীকে নিয়ে রুমের দরোজা আটকে দিলাম। ব্রিটিশ আর আমেরিকান রোগী খুব ভয় পেয়ে গেলো। শঙ্কিত গলায় বললো, 'তোমার প্রেমিকা নিশ্চয় ডাক্তারকে বলবে তোমাকে শাস্তিস্বরূপ একটি ইনজেকশান যেন বেশি দেয়া হয় ! বুনো আফ্রিকান নির্বিকারভাবে বললো, তোমাদের ধারণা ভুল। আমি প্রেমিকার সঙ্গে আসিনি। এসেছি তার বান্ধবীর সঙ্গে। সে ডাক্তারকে বলেছে, আমাকে যেন ইনজেকশান না দিয়ে শুধু আমার হাত আর পায়ের নখগুলো কেটে দেয়া হয়!

ভালোবাসা মরে যায়, মুগ্ধতা মরে না!

সাতানব্বইয়ের ফেব্রুয়ারি। বইমেলাতে গোলাপ হাতে নিয়ে প্রতীক্ষায় আছে ছেলেটি। তার দীর্ঘ দিনের প্রেমিকা আজ চলে আসবে। ঘর বাঁধবে তারা আজ। ছেলেটি প্রতীক্ষায় থাকলো। কবিতা আবৃত্তির ক্যাসেট কিনলো যার শিরোনাম, ভালোবাসা মরে যায়, মুগ্ধতা মরে না।

ঘরে ফেরার সময় ছেলেটির তসলিমা নাসরিনের কবিতা মনে পড়লো। আজকাল অর্থকড়ির গন্ধ ছাড়া গরিবের গোলাপ থেকে সুগন্ধী নেয় না কেউ! সে গোলাপটি ছুড়ে ফেললো ডাস্টবিনে। দুদিন পরে সে জানলো, তার দীর্ঘদিনের প্রেমিকা বিয়ে করেছে কোটিপতির একমাত্র ছেলেকে। প্রেমিক ছেলেটির প্রতীক্ষার অবসান হলো। সে এখন মুক্ত, নিঃসঙ্গতার মতো একা।

ছেলেটি এরপর দুটো জিনিস জেনেছে। প্রথমটি কেন তার প্রেমিকা কোটিপতির ছেলের সঙ্গে ঘর বাঁধলো। মুগ্ধতা। হ্যাঁ বিত্ত-বৈভবের প্রতি মুগ্ধতা। দ্বিতীয়টি, ভালোবাসা মরে যায়, মুগ্ধতা মরে না ক্যাসেটে কবিতা আবৃত্তি করেছেন একজন ছাত্রনেতা, যার নাম হাবীব উন নবী সোহেল। ছেলেটির খুব ইচ্ছে করলো জানতে, আচ্ছা, দেশপ্রেম—যার কথা রাজনীতিবিদরা খুব বেশি বলে, সেটা তো শতকরা ১০০ ভাগ প্লেটোনিক প্রেম। মানুষ তো ইদানীং প্লেটোনিক প্রেমকে কাল্পনিক আর ফ্রয়েডীয় প্রেমকে বাস্তব বলে জানে। তাহলে কি রাজনীতিবিদদের দেশের প্রতি ভালোবাসাটা একেবারেই মরে গেছে, কাল্পনিক হয়ে গেছে? মুগ্ধতা জন্মেছে শুধু অর্থবিত্ত আর ক্ষমতার প্রতি ?

ছেলেটির খুব ইচ্ছে হয়, একদিন সে জিজ্ঞাসা করবে হাবীব-উন-নবী সোহেলকে। ছেলেটির সঙ্গে কখনো তার দেখা হয় না। মাঝে মাঝে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে দেশপ্রেম কিংবা ভালোবাসা গরিবের গোলাপের মতো ডাস্টবিনে মরে থাকে, চিরমুগ্ধতা থাকে শুধু অর্থবিত্ত আর ক্ষমতার ভেতর!

হ্যাপি লোড শেডিং টু ইউ

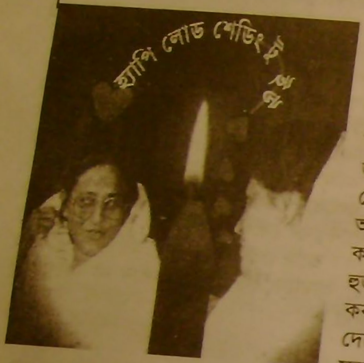

ঢাকার অদূরে গাজীপুরের শিমুলতলীর একটি মক্তব। মক্তবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। শিক্ষার্থীদের কষ্ট অবর্ণনীয়। মক্তবের ওস্তাদ বয়ান করেন ছাত্রদের, মাতৃগর্ভে আমরা অন্ধকারেই থাকি। জীবন শেষে এমন ঘরে যেতে হবে যেখানে নাই বাত্তি। ভাই সকল, অন্ধকারে থাকার অভ্যাস করুন। কবরে কম কষ্ট হবে। আমার মনে হয়, ওস্তাদ হুজুর আর সরকারের ধারণা এক। কবরে যেন কষ্ট কম হয়, সে কারণে দেশে লোডশেডিং-এর ব্যবস্থা করে সরকার দেশের মানুষকে আগাম প্রশিণ দিয়ে রাখছেন। সরকারকে ধন্যবাদ।

বোনাস খবর

ছাত্রদল ১৯৯৮ সালের ১০ অক্টোবর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণ ঘটনার প্রকৃত তদন্ত এবং অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। আমার স্কুলজীবনের এক বন্ধু ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা। এক বক্তৃতায় সে বলেছিল, শুধু জাহাঙ্গীরনগরে নয়, সারাদেশে ধর্ষণ বেড়ে গেছে। ধর্ষণকারীদের প্রিয় জায়গা জনমানবহীন অন্ধকার কোনো স্থান। লোডশেডিং-এর কল্যাণে সারাদেশ অন্ধকারে রেখে বর্তমান সরকার ধর্ষণকরীদের উস্কে দিচ্ছে। শেখ হাসিনার সরকার ধর্ষণকারীদের পক্ষের সরকার। খালেদা জিয়ার শাসনামলেও লোডশেডিং ছিল। তারাও কি ধর্ষণকারীদের পক্ষে ছিলেন?

ছাত্রদল নেতা আমার সেই বন্ধুকে রংপুরের এক জনসভায় দেয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের ভাষণের তিনটি লাইন বলেছিলাম। লাইন তিনটি এমন-

খালেদাকে খেয়েছে সারে (সার কেলেংকারি),
হাসিনাকে খাবে তারে (বিদ্যুৎ)
জনগণ চায়-আমারে!

বন্ধুটি মন্তব্য করেছিল-জনগণ ওনাকে কখনোই চায় না। আর উনি নিজেও লোডশেডিঙের পক্ষে। কারণ এরশাদের নারীপ্রীতি সর্বজনবিদিত। নারীপ্রীতির জন্য লোডশেডিং বা অন্ধকার মোম পরিবেশ।

সন্দেহ

আট বছরের ছেলে সিয়াম। তার ভালো লাগে সান্ধ্যকালীন লোডশেডিং। কারণ পড়ালেখা মাফ। যদিও পড়ার টেবিলে চলে আসে মোমবাতি, মোমের আলোয় সে পড়ালেখা করবে না। কারণ মোমবাতি হচ্ছে জন্মদিনের জিনিস। প্রতিদিন কি

জন্মদিন হয়? সিয়ামের জন্য কিনে আনা হয় চার্জার। রাগ কমানোর জন্য হুমায়ূন আহমেদ তার নাটকে 'গ্লাস' ভাঙা শিখিয়েছিলেন। লোডশেডিং কেন অনেকক্ষণ থাকে না, কেন চার্জার কিনে আনা হয়, সে কারণে সিয়াম 'চার্জার' ভেঙে রাগ কমায়। বাধ্য হয়ে সিয়ামের বাবা-মা কিনে আনে ছোট মাপের জেনারেটর । কবি-সাংবাদিক আনিসুল হক *সাপ্তাহিক চলতিপত্রে* লিখেছেন, মোমবাতি, হারিকেন, হাতপাখা, জেনারেটর, চার্জার ইত্যাদির ব্যবসায়ীর সঙ্গে সরকারের কোনো গোপন চুক্তি হয়নি তো?

হতেও পারে। বাংলা ভিলেন এবং জাসাস নেতা রাজীব তো বলেই রেখেছেন এই সরকার চুক্তিবাজ সরকার।

লোডশেডিং : ভালেবাসা

ব্যাচেলরদের খুবই কষ্ট । কোনো বাড়িওয়ালা তাদের বাসা ভাড়া দিতে চায় না। আমার বন্ধু মিথুন। পাঁচ বছর ধরে মুরগির খোপের মতো এক বাসায় বাস করে আসছিল। তার এই দীর্ঘদিন একই বাসায় ভাড়া থাকার রহস্য আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি। বুঝেছি গলাধাক্কা দিয়ে মিথুনকে বাসা ছাড়া করবার পর।

এক রাতে সেই বাড়ির সবার ঘুম ভেঙে যায়। ভাড়াটেরা শুনতে পায়, বাড়িওয়ালি ভূত ভূত বলে চিৎকার করছে। তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে গিয়ে দেখে বাড়িওয়ালি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

বাড়িওয়ালির একমাত্র কন্যাকে ম্যানেজ করে ফেলেছিল মিথুন। ওই অঞ্চলে রাত ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত লোডশেডিং চলতো। এই সুযোগে মিথুন পৌঁছে যেতো বাড়িওয়ালির মেয়ের বিছানায়। একদিন টের পায় বাড়িওয়ালি। মেয়ের রুমে এসে প্রথম কিছুই খুঁজে পায় না অন্ধকারে । কিন্তু কুঁচকুচে কালো মিথুন এসব দেখে হেসে ফেলে। অন্ধকারে মিথুনের দাঁত দেখে ভড়কে যায় বাড়িওয়ালি। ভূত ভূত বলে জ্ঞান হারায়।

শোডশেডিং ভালোবাসায় উপরি পাওনা বাড়িওয়ালির একমাত্র কন্যাকে ভুলতে পারেনি মিথুন। সব ব্যাচেলরদের জীবনে লোডশেডিং কেন যে এমন উপরি ভালোবাসার যোগান দিতে পারে না!

পরীক্ষা প্রস্তুতি

লোডশেডিং এখন একটি আলোচিত বিষয়। আড্ডায়, সংসদে, বিতর্কে লোডশেডিং নিয়ে কম কথাবার্তা খরচ হয় না। ভবিষ্যতে পিএইচডির বিষয় হিসেবে লোডশেডিং মন্দ হবে না। সে কারণে লোডশেডিঙের ওপর কিছু আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা যেতে পারে।

প্রশ্ন : লোডশেডিং কি বাংলাদেশের নিয়তি?
উত্তর : হ্যাঁ। যে দেশে মিটার-রিডারদের চার-পাঁচটি করে আলিশান বাড়ি থাকে, সে দেশে লোডশেডিং তো থাকবেই।

প্রশ্ন : বিদ্যুৎহীনতায় কে বাঁচিতে চায়?

উত্তর : চোর, ছিনতাইকারী, পুলিশ ও পতিতা।

প্রশ্ন : সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী লে: জে: (অব:) নুরুউদ্দীন খান লোডশেডিং ভালোবাসতেন কেন?

উত্তর : দুটো কারণে ভালোবাসতেন। প্রথম কারণ হচ্ছে তিনি সৈনিক মন্ত্রী ছিলেন। সৈনিক জীবনে বহুবার 'নিষ্প্রদীপ মহড়া'য় অংশ নিয়েছেন। মন্ত্রী হবার পরও সৈনিক-জীবনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করার জন্য লোডশেডিং-এর ব্যবস্থা রাখতেন।

এই মন্ত্রী একবার আহত হয়েছিলেন। চিকিৎসক তাকে বলেছিলেন লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি ব্যবহার করতে। তিনি তো মন্ত্রী। তার কি সিঁড়ি ভাঙা সাজে? তিনি লোডশেডিং-এর ব্যবস্থা করলেন। তার অফিসে তার সম্মান ঠিকই থাকল।

অ্যামিবা বাঙাল

লোডশেডিং অব্যাহত থাকলেও বাঙালি এ কারণে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেনি। অ্যামিবার মতো সবকিছু মেনে নিয়েছে। মেনে নেওয়ার জন্য তাদের পক্ষে কলম ধরেছিলেন শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ এবং একালের হুমায়ূন আহমেদ।

শরৎচন্দ্র তার শ্রীকান্ত উপন্যাসে আঁধারের রূপ বর্ণনা করেছিলেন দু-তিন পৃষ্ঠাব্যাপী। অন্ধকারকে ভালোবেসে অনেক কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ। আর হুমায়ূন আহমেদ নতুন করে জোসনাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। লোডশেডিং না থাকলে কি জোসনার সৌন্দর্য পুরোপুরি অবলোকন করা যায়? বাঙালি লোডশেডিং-এর অন্ধকার নিয়ে যেন বেশ ভালো আছে। বাঙালির মনস্তত্ত্ব বুঝে গান গেয়ে মাত করেছেন শিল্পীরা। এমন একটি হিট্ গান—এ আঁধার কখনো যাবে না মুছে, আমার পৃথিবী থেকে।

তেলের ফেরিওয়ালা

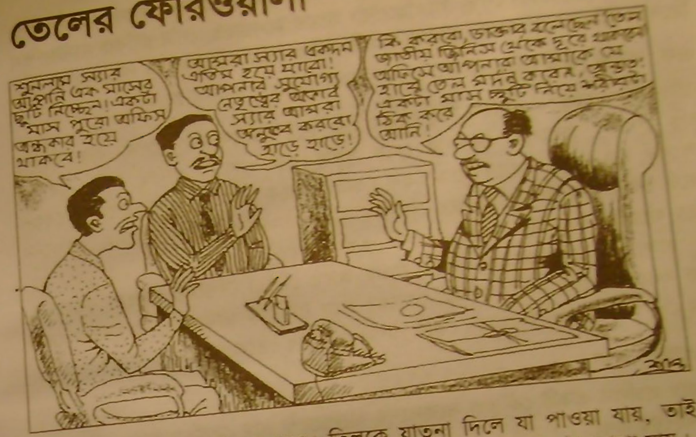

তেল শব্দটির উৎপত্তি তিল থেকে। তিলকে যাতনা দিলে যা পাওয়া যায়, তাই তেল। কিন্তু এখন তেল বলতে কেবল তিলের নির্যাস নয়, বহু কিছুই বোঝা যায়। যেমন মানুষের শরীরে তেল হয় আমরা বলি, ব্যাটার তেল হয়েছে। আবার যে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বিশেষ রঙের সাবান ব্যবহার করতে হয়, সেই ত্বকের তেলটা আসে শরীরের ভিতর থেকেই।

তিলের ফেরিওয়ালা

রান্নায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের তেল, গায়ে মাথার তেল, কলকারখানা-যন্ত্র চালু করার বিভিন্ন ধরনের তেল, হারিকেন বা গাড়ি, ট্রাক, মোটরসাইকেলের তেল নিয়ে আমাকে লিখতে বলা হয়নি। অথবা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায় যে মহামূল্যবান তেল, যার বাণিজ্য নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যখন তখন যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেই তেলও আমার লেখার বিষয় নয়।

তবে তেল নাকি আরো আছে। বিটিভিতে প্রচারিতব্য ড্রামা সিরিয়াল ডালাস নিয়ে একবার ব্যঙ্গ কাহিনী ছেপেছিল এক কার্টুন পত্রিকা। সেই ব্যঙ্গ কাহিনীর বলে বাংলাদেশে তেল পাওয়া গেছে জেনে ডালাসের জে. আর চরিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা এসেছিলেন বাংলাদেশে। এসেই পড়েছিলেন ম্যানহোলে। ম্যানহোল থেকে উঠে দুর্গন্ধে নাক চেপে ধরে জে. আর বলেছিলেন ক্রুড অয়েল। ক্রুড অয়েল।

রাস্তায় তার দেখা হয়েছিল তেলের ক্যানভাসারদের সঙ্গে। তারা বিবরণ দিচ্ছিল জোঁকের তেল। মান্ডার তেল। গন্ধ গোকুলের তেল। ব্যবহারের পর আর জাতীয় সঙ্গীত গাইবার দরকার নেই। পাহাড়ের মতো শক্ত হয়ে যায়। ৪০ কেজি বাটখারা বেঁধেও নরম করা যায় না। ভাগ্যিস জে. আর বাংলা বোঝেন না, নইলে বলতেন ভালগার অয়েল (অথবা ভায়াগ্রা অয়েল)?

অবশ্য আমি যে তেল নিয়ে লিখতে যাচ্ছি তার সংজ্ঞা কী? বহু আগে এই ব্যাপারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটা লেখা লিখেছিলেন। আমার জানামতে, সেটা ক্লাসিক মাস্টারপিস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কোনো আগ্রহী পাঠক সেটা পড়ে দেখতে পারেন।

এক. কাকে তেল দেবেন?

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা। একদিন কিছু বেগুন রান্না করে রাজাকে খাওয়ালেন। রাজা দারুণ তৃপ্তি পেলেন, বললেন, বেগুনের চেয়ে সুস্বাদু আর কোনো খাবার নেই। হোজ্জা বললেন, হক কথা। এভাবে হোজ্জা এক সপ্তাহ রাজাকে বেগুন রান্না খাওয়ালেন। বেগুন খেতে খেতে রাজার বিরক্তি ধরে গেলো। রাজা হোজ্জাকে ডেকে বললেন, বেগুনের চেয়ে বাজে খাবার নেই। হোজ্জা বললেন, হক কথা।

রাজা তো মহাখাপ্পা। মাত্র এক সপ্তাহ আগে হোজ্জা বেগুনের প্রশংসা করেছেন, আজ বলছেন উল্টো কথা। হোজ্জা বিনয়ের সঙ্গে রাজাকে জানালেন, আপনাকে তেল দিয়ে তো অনেক লাভ অবতার। কোন পাগল বেগুনের তেলে সময়পাত করে?

দুই. তেল শেখা

রাশিয়ায় প্রচলিত একটি কৌতুক সংকলনের বাংলাদেশী নাম *সোভিয়েতস্কি কৌতুকভ*। সেই বইয়ের একটি কৌতুক :

স্টালিনের সময়ের কথা। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো পুশকিনকে সম্মানিত করা হবে তার একটি মূর্তি নির্মাণের মাধ্যমে। মোসায়েবরা বললো, শুধুমাত্র পুশকিনের মূর্তি গড়া হলে কিভাবে বুঝে নেয়া যাবে যে, স্টালিন তাকে সম্মানিত করেছেন?

সিদ্ধান্ত পাল্টানো হলো, সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুশকিন স্টালিনের লেখা একটি বই পড়ছেন—এমন মূর্তি বানানো হবে।

কিন্তু সেটি ঐতিহাসিকভাবে সম্ভব নয়। কারণ পুশকিনের যুগে স্টালিন জন্মাননি।

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হলো এমন—স্টালিন পুশকিনের একটি বই পড়ছেন এমন মূর্তি বানিয়েই পুশকিনকে সম্মানিত করা হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলো। পুশকিনের সম্মানার্থে যে মূর্তি বানানো হলো, সেটা উদ্বোধনের পর দেখা গেলো, স্টালিন তার নিজের লেখা একটি বই পড়ছেন।

মোসায়েবী ধামাধরাদের তেল মারার এসব উদাহরণ এ দেশেও প্রচুর পাওয়া যায়। আটটার সংবাদ দেখুন। অথবা ক্ষমতায় আসার এক বছরের মাথায় টিভিতে জবাবদিহিমূলক অনুষ্ঠান (?) সবিনয়ে জানতে চাই-এর কথা স্মরণ করুন। বিভিন্ন জনসভায় নেতানেত্রীদের সম্পর্কে তাদের অধস্তনদের বিশেষণগুলো শুনুন। আর বিশেষ কোনো কিছু শিখতে হবে না। বাংলাদেশের জলবায়ু এমনিতেই তেলভাবাপন্ন। জন্মগতভাবেই এখানে মানুষ তৈলাক্ত হতে শেখে।

তিন. ১০০ হাত দূরে থাকুন

তেল পেলে নাকি ওপরওয়ালারা স্বাভাবিকভাবেই গলে থাকেন। নেপোলিয়নের এক সহকর্মী তাকে বলেছিল, সম্রাট আপনাকেই দেখলাম, তেল দিলেও যিনি একটু গলেন না।

সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছিলেন, ইন দিস মোমেন্ট, আই রিয়েলি ফ্লাটার্ড।

তবে তেল দিতে জানাও একটি আর্ট। রীতিমতো শিল্প। তেল উল্টো হয়ে গেলে খবর আছে।

রাশিয়ায় একবার বইমেলা হচ্ছে। খবর পাওয়া গেলো সেই বইমেলায় বার্নার্ড শ উপস্থিত থাকবেন। এক পুস্তকবিক্রেতা তার স্টলের অন্য সব লেখকের বই সরিয়ে ফেলে শুধু বার্নার্ড শ'র বই রাখলো। বিক্রেতা ভাবলো, শুধু নিজের বই দেখে বার্নার্ড শ যদি স্টলে এসে কিছুক্ষণ বসেন, তবে বিক্রি নিশ্চয়ই বহুগুণ বেড়ে যাবে। বার্নার্ড শ এলেন। জানতে চাইলেন অন্য কোনো লেখকের কোনো বই নেই কেন? বিক্রেতা অপ্রস্তুত হয়ে বলে ফেললো, জ্বি সেগুলো তো বিক্রি হয়ে গেছে।

বার্নার্ড শ এরপর সেই মেলাতে এক মুহূর্তও থাকেননি। তবে যেভাবে হোক, যে উপায়ে তেল দেয়া হোক না কেন তেলবাজ মোসায়েবদের কাছ থেকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। নইলে বিপদ হতে পারে। স্টালিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন ক্রুশ্চেভ। স্টালিনের শাসনামলের প্রশংসায় ঢাউস ঢাউস বই লিখেছিলেন ক্রুশ্চেভ। স্টালিনের মৃত্যুর পরে ইতিহাস থেকে তার নাম মুছে ফেলার প্রধান দায়িত্বটি নিয়েছিলেন এই ক্রুশ্চেভই!

বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশংসায় সবচেয়ে বেশি উদ্বেল থাকতেন নাকি খন্দকার মোশতাক। মুজিব হত্যার পর খন্দকার সাহেবের কার্যক্রম সবারই জানা।

সাবেক রাষ্ট্রপতি হো. মো. এরশাদের মাতৃবিয়োগের পর তার পার্টির মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর কান্না দেখে নাকি এরশাদ সাহেব নিজেই লজ্জা পেয়েছিলেন। সেই মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ শাহ মোয়াজ্জেম ও কাজী জাফর জাতীয় পার্টিকেই একবার খণ্ডিত করে ফেলেছিলেন। পরে অবশ্য আবার এরশাদের সাথেই ভিড়েছেন।

তবে বুদ্ধিজীবীদের প্রশংসাকে কি 'তেল' বলা যাবে? যদি বলা যায়, তবে পরিচিত কবি, বুদ্ধিজীবী, নাট্যকার, অভিনেতা, কলামিস্টদের তেলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার সর্বদা দারুণ তৈলাক্ত হয়ে থাকেন—এমন বলা যেতো।

আমি জানি না, প্রখ্যাত লেখক আহমদ ছফা কেন বলেছেন আওয়ামী লীগের পতনের জন্য বুদ্ধিজীবীরাই যথেষ্ট!

নিষিদ্ধ সংসদীয়

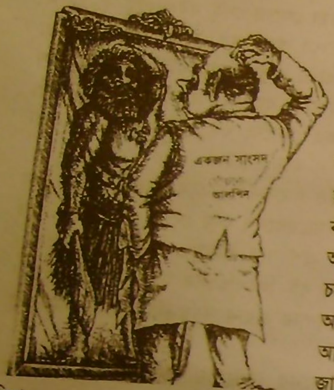

বাচ্চা লোক কানে আঙুল দাও

ঘুরতে গিয়েছি সংসদ ভবনে। সেখানে কার্টুনিস্ট আহসান হাবীবের সঙ্গে দেখা। একমাত্র কন্যাকে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আহসান হাবীবের মেয়ের চলাফেরা দেখে আমি অবাক। মেয়েটি কানে আঙুল দিয়ে হাঁটছে। আমি জানতে চাইলাম 'ব্যাপারটা কী?'

আহসান হাবীব জানালেন, 'সংসদ অধিবেশন চলছে তো। আমাদের মাননীয়রা যেভাবে অশ্লীল খিস্তি খেউর করেন, আমি চাই না আমার মেয়ের কানে সে সব প্রবেশ করুক।' জানি না কেন, আমার মাথায় এক বিপরীত চিন্তা ভর করলো।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গালাগালি করলে বাবামায়েরা আগে খুব বেশি চিন্তিত হয়ে পড়তেন। ছেলেমেয়ে যেন গালি না দেয় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। তারা যেন গালি না শিখতে পারে সেজন্য 'গালির উৎসমুখ' বন্ধ করার চেষ্টা করতেন অর্থাৎ 'গালি মেশিন' হিসেবে পরিচিত কারো (হোক সে কাজের বুয়া, রাস্তার লোক, বস্তিবাসী) সংস্পর্শে যেন ছেলেমেয়েরা না যেতে পারে, সেই চেষ্টায় দিনপাত করতেন।

এখন কি সময় বদলেছে?

ছোট ছোট বাচ্চারা 'গালিয়া' প্রাকটিস করলে বাবা-মা'রা কি এখন থেকে উৎসাহিত হবেন? ভাববেন যে এই ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে আমাদের 'মহামান্য সাংসদ' না হয়ে ছাড়বে না! দেশের তাবৎ বাবা-মায়েরা যাই ভাবুন, আহাদের 'দাদু' তার ধার কাছ দিয়ে যান না।

আহাদ আমার পরিচিত। একটা কারণে তাকে আমি বলি 'অজপাড়াগাঁয়ে'র বাসিন্দা। তার বাসায় ডিশের সংযোগ নেই। আমি তাকে তার বাসায় খুঁজতে গিয়েছি। সে আমাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখে বাসার ভেতরে গিয়েছে। বিটিভিতে সংসদ অধিবেশন প্রচার হচ্ছে। এক মহিলা সাংসদ খালেদা জিয়া ও তার সম্পর্কে লেখা দেয়াললিখন অশ্লীল ভঙ্গিতে ছন্দে ছন্দে উপস্থাপন করছেন। এমন সময় ড্রয়িং রুমে ঢুকলেন আহাদের দাদু। চিৎকার করে বললেন, 'বন্ধ কর বন্ধ কর টেলিভিশন।' আমি অপ্রস্তুত। আহাদ এসে টিভি বন্ধ করে দিলো। আহাদের দাদু চিৎকার করে বলতে থাকলেন, বুড়ো বয়সে ওজু করতে কষ্ট লাগে। যাগো কথাবার্তা শুইনা অজু নষ্ট হয়, মিনিটে জনগণের ১৮০০ টাকার বিনিময়ে হেগো কথাবার্তা শোনার কোনো প্রয়োজন নেই! আহাদের দাদুর কথা শুনে আমার বাবার কথা মনে পড়লো।

'৮৯ সালের ঘটনা। বুয়েটের সোহরাওয়ার্দী হলে এক রাতে খুলনা থেকে বাবা আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। ক্যাম্পাসে তখন বিদ্যুৎ নেই। সোহরাওয়ার্দী হলের সঙ্গে রশিদ হলের তীব্র গালিবর্ষণ প্রতিযোগিতা চলছে। এমন চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার আর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে টানাটানির প্রতিযোগিতার মাঝে বাবা আমার রুমে মাথা হেট করে বসে আছেন। আমার কিছুই করার নেই। বিদ্যুৎ না এলে এই গালিবর্ষণ প্রতিযোগিতা কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না। আমরা আলোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। পরদিনই বাবা খুলনা ফিরে গেলেন আমাকে নিয়ে। 'বুয়েট কেমন দেখলেন' পরিবারের অন্য অনেকের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি আমার দিকে তাকাতেন আর বলতেন, 'ভালো, ভালো'। তবে অন্ধকার হলে ওদের গালাগালি ছাড়া অন্য কোনো বিনোদন থাকে না।

পরের বছর বাবা ঢাকা মেডিকেলের ফজলে রাব্বি হলে আমার ছোট ভাইকে দেখতে গিয়েছিলেন। কারেন্ট চলে গেলে সেখানেও শুরু হয়ে গিয়েছিল একই কাহিনী। তবে দুই পক্ষে ছিল ফজলে রাব্বী হল বনাম বুয়েটের শহীদ স্মৃতি হল। একদল ওই মিস্ত্রির বাচ্চা বলে শুরু করে তো অন্যদল ওই কবিরাজের বাচ্চা বলে জবাব দেয়। ঠিক পরের দিনই বাবা খুলনা ফিরে গিয়েছিলেন আর কেমন দেখলেন মেডিকেল এই প্রশ্নের উত্তর তার একইরকম ছিল।

অবসরজীবনে সময় কাটানোর জন্য বাবা এখন অনেকটাই টিভির ওপর নির্ভরশীল। তাকে হয়তো মাঝে মাঝে টিভিতে সংসদ অধিবেশন দেখে সময় কাটাতে হয়। কেমন দেখলেন সংসদ এই প্রশ্নের জবাবে কী বলবেন বাবা?

'ভালো, ভালো, তবে সংসদ অধিবেশন চলাকালে সমস্ত দেশে যেন লোডশেডিঙের ব্যবস্থা রাখা হয়'।

সংসদ কেন গালিবাজ

আসলে মানুষ গালি দেয় কেন? বিবিধ কারণে, যেমন– শিক্ষার অভাবে, কুশিক্ষার প্রভাব, মুদ্রাদোষ, রাগ প্রশমন, কখনো সখনো বৈশিষ্ট্যগত কারণে নাকি মানুষ গালি দেয়। স্কুলের শিক্ষক ছাত্রকে গরু-গাধার সঙ্গে তুলনা করলে আমরা তাকে গালি বলি না, কিন্তু শূকর আর কুকুরের সঙ্গে তুলনা করলে সেটা গালি। কী অদ্ভুত! আবার সিংহের সঙ্গে তুলনা করলে সেটা প্রশংসা।

আসলে কে না গালি দেয়? শিক্ষক ছাত্রকে দেয়। প্যাসেনজার রিকশাওয়ালাকে দেয়। আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, পুলিশ আর মেরিন একাডেমিতে তো সর্বনিকৃষ্ট গালিসমূহের 'ইংরেজি ভার্সান' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই দেশটাই যখন পুরো গালিময়, তখন মহামান্য সাংসদরা দিলে কী দোষ?

গালি দেয়ার পর উপকার তো কম মেলে না। হোটেলে গিয়ে ভদ্রভাবে চা চাইলে চা নাকি সিলেট ঘুরে আসে। টেবিলের ওপর গ্লাস দিয়ে শব্দ করে বেয়ারাকে ঝাড়ি দিয়ে অর্ডার দিলে চা নাকি টর্নেডোর বেগে নিয়ে আসে বেয়ারা। ছিনতাইকারীর ছুরি আর গালির ভয়ে পথচারী নাকি সর্বস্ব দিয়ে দেয়।

গালি দেয়াতে যখন এত লাভ, তখন সাংসদরা দেবেন তাতে আর ক্ষতি কী? কিন্তু তারা কি শুধুই গালি দেন?

প্রিয় পাঠক, আসুন একটা সংসদ অধিবেশনের লঙ্কাকাণ্ডের প্রস্তুতিটা শুনি। বাজেট পেশের পর সংসদে আলোচনা হচ্ছে।

বিএনপির একজন : আইনজীবীদের ওপর ভ্যাটের বোঝা চাপানো হয়েছে। বিএনপিতে বহু আইনজীবী আছেন আর মামলাবাজ সরকার বিএনপির বহু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। বিএনপিকে সর্বস্বান্ত করার জন্য এমন ভ্যাট বসানো হয়েছে।

বিএনপির উক্ত এমপির জবাবে আওয়ামী লীগের একজন বললেন, উনি সব সময় মদ খান, তবে আজ একটু বেশি খেয়েছেন। এ কারণে এভাবে আবোল-তাবোল বকছেন।

এরপর বিএনপির আরেকজন আর বাজেট নিয়ে থাকলেন না। তিনি চলে গেলেন লন্ডনে। বললেন, প্রধানমন্ত্রী তনয় জয় মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য সেখানে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন।

আওয়ামীলীগের আরেকজন তখন ঢুকলেন খালেদা জিয়ার ঘরে। বললেন, 'তারেক জিয়ার ফ্রিজে নাকি মদের বোতল পাওয়া যায়' (উনি কেমন করে দেখলেন– সে প্রশ্ন পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি)। প্রিয় পাঠক, গালিগালাজের সাথে এমন খিস্তি-খেউর, অশ্লীলতা চলে আসছে অনেক সময় ধরে। সংসদের বর্তমান অধিবেশনে একটু বেশি বেশি হচ্ছে এই যা। প্রিয় পাঠক, আসুন মহামান্যদের গালাগালি, অশ্লীল খিস্তি-খেউর না শুনে তাদের এই খিস্তি-খেউরের কল্যাণে সমাজটা কীভাবে বদলে যাচ্ছে, কতোটা লাভ-ক্ষতি হচ্ছে, আমরা সেগুলো নিয়ে চিন্তা করি।

সংসদীয় প্রভাব

এক. ইটালিয়ান একটা প্রবাদ আছে এমন, 'ড্রাইভিং শেখার আগে গালাগালি শেখাটা জরুরি'। আসলেও তাই। কেউ তলে পড়ুক গাড়ির কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু মূল্যবান গাড়িতে যেন সামান্য টোকা না লাগে। আর যদি লেগেই যায়, 'শালা ছোটলোকের বাচ্চা' বলে যেন ঝাড়িটা শুরু করা যায় এই আর কি! সুতরাং ড্রাইভিং শেখার আগে যারা গালি শিখে নিতে চাচ্ছেন, তারা সবাই এখন ছুটছেন সংসদ ভবনের দিকে।

দুই. বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। গ্যারেজ ভাড়া, অফিস ভাড়াও মেলে। ইদানীং ভাড়াটে গালিবাজও মিলছে। স্টক সীমিত। ঠিকানা : জাতীয় সংসদ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

তিন. নীলক্ষেত মোড়ে অনেক কিছুই পাওয়া যেতো। পাঠ্য বই, গল্প-কবিতা-উপন্যাস, খাতা-কলম, স্টেশনারি দ্রব্য, পেপার-পত্রিকা, আরো অনেক কিছু। নেশাকারক দ্রব্যের মতো গোপনে আরো একটি জিনিস পাওয়া যেতো। সেটা হচ্ছে, অশ্লীল বই-পত্রিকা বা চটি। ইদানীং এই জিনিসটির মার্কেট পড়ে গেছে। সবাই নাকি ছুটছে সংসদ ভবনের দিকে।

শুনেছি, উইনস্টন চার্চিলের বক্তৃত-বিবৃতিগুলো দাড়ি-কমা দিয়ে প্রকাশ করলে সেগুলো জ্ঞানগর্ভ বই হবে। কিন্তু খালেদা-হাসিনার বক্তৃতা-বিবৃতি দাড়ি কমা দিয়ে প্রকাশ করলে সেগুলো খিস্তি-খেউর ছাড়া কিছুই হবে না।

আনিসুল হক লিখেছেন, নিষিদ্ধ উপন্যাসের প্রকাশকরা নাকি ইদানীং তাই সংসদ ভবনের দিকেই ছুটছেন। তবে নীলক্ষেতের বই বিক্রেতারা জানিয়েছেন, সাংসদদের পারফরমেন্সের কাছে ধরা খেয়ে ব্যবসা লাটে ওঠার পর অশ্লীল সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা রসময় গুপ্ত নাকি এখন নীলক্ষেত ছেড়ে সংসদ ভবনেই ঘোরাফেরা করছেন আর ভবিষ্যতে এমপি ইলেকশন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

চার. আগে সংসদ ভবনে মানুষেরা খুব বেশি ভিড় করতো। এত মানুষের ভিড়ে সংসদ ভবনের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। ইদানীং এই ভিড় অনেকটা কমেছে। অধিবেশন চলাকালীন সময়ে অনেক দম্পতি তাদের ছেলেমেয়েকে গালাগালি থেকে দূরে রাখার জন্য সংসদে নিয়ে যাচ্ছেন না।

পাঁচ. আ স ম আব্দুর রব অনেক আগেই সংসদকে 'শুয়োরের খোয়াড়' বলেছিলেন। নতুন করে সংসদকে তিনি আর কোনো বিশেষণ দেননি অর্থাৎ সংসদ আগের মতোই আছে।

ছয়. আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো চাত্র খুন হলে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে যেতো। এখন কেউ খুন হলেও ছাত্ররা ক্লাস করে। কোনো কিছুই মনে করে না। ফলের দোকানদার, নদী কিংবা জমি দখলকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিস্কৃত ক্যাডার, বোমাবাজ, পতিতাসহ গ্রেপ্তারকৃত সব কিসিমের এমপিই আছে সংসদে। সুতরাং এসব এমপির সংসদ কার্যকলাপ দেখে কেউ যদি দুঃখ কিংবা লজ্জা পায়, তবে দায়ভাগ তার একান্ত নিজস্ব।

সাংসদ রঙ্গ

এক. বাজেটের পর বাজারে পারফিউমের দাম কি বেড়েছে?

এলিফ্যান্ট রোডের এক দোকানির চটপট উত্তর, খুব একটা বাড়েনি তবে 'মাউথ ফ্রেশনারের' (মুখের সুগন্ধিবর্ধক) বিক্রি বেড়েছে অনেক!

বেশি কারা কিনছেন? দোকানির চটপট উত্তর, পুরুশ এমপিরা স্ত্রীরা আর মহিলা এমপির স্বামীরা। তবে জনসভার পাবলিক তো আছেই।

দুই. একটি কার্টুন পত্রিকার সম্পাদক তার পত্রিকার টেলিফোন নম্বরের আগে লিখে দিয়েছিলেন–'সরাসরি গালি......৯০০....

প্রতিদিন গালিময় টেলিফোন পেতেন তিনি। টেলিফোনে গালি শোনার পর তিনি সবিনয়ে বলতেন, 'গালিগুলো আমিও জানি তবে আপনি দিলেন, আমি দিচ্ছি না। আপনার আর আমার পার্থক্যের সূচকটা এখানেই'।

বর্তমানে আমরা যারা অতি সাধারণ, তাদের সঙ্গে মহামান্য সাংসদদের পার্থক্যের সূচকটা তাহলে কী?

তিন. সংসদ ভবনের সামনে এক ভ্রাম্যমাণ পতিতার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে এক পুলিশ। তাকে গালি দিচ্ছে সেই পতিতা। এই পুলিশের সাক্ষাৎকার–

: ঘুষ খান ভাই?

প্রায়ই তো খাই।

: মদপান করেন?

মাঝে মাঝে করি।

: আপনার কি ভবিষ্যতে রাজনীতি করা বা এমপি হওয়ার ইচ্ছে আছে?

ছিঃ ছিঃ এটা কী বললেন ভাই? আমার মুখ এত খারাপ নয় আর আমি এত খারাপও হতে পারবো না।

শেষ চিঠি

আব্দুল্লাহ আল কাফি। ঢাকা কলেজের ছাত্র। সে আমাকে ঢাউস আকৃতির এক চিঠি লিখেছে। সেই চিঠির অংশবিশেষ :

আমার শহরতলিকে ঘিরে আমি বেশ ভালোই আছি। এখানে বস্তি আছে কিন্তু কোনো খিস্তি-খেউর নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি আছে, লোডশেডিং, মিছিল-মিটিং, হরতাল আছে কিন্তু কোনো ছিনতাইকারী নেই। টপটেরর নেই। কোনো সন্ত্রাসী বা গডফাদারদের কার্যক্রম এই মুহূর্তে নেই। কোনো অভদ্র, ইতর নেই। কারণটা কী? খুব সহজ কারণ, এটা সতি সত্যি কোনো চাপা নয়। এসবের পেছনে মূলত যে ব্যক্তিটি জড়িত আমরা তাকেই নির্বাচিত করে সংসদে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই আমার শহরতলিতে এই মুহূর্তে যিনি নেই, সংসদে তেমন অনেকেই আছেন। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

১৯৯৯ সালের ৮ জুন আওয়ামী লীগ এমপি আনিসুল হক চৌধুরী সংসদে বলেছেন, 'বাবা-মাকে শুয়োর-কুকুর বলা হয় সংসদে, এতে জাতি কী ভাবছে তা বোঝা উচিত। সংসদের যে অবস্থা তাতে কোনো ভদ্র সন্তান সংসদে থাকতে পারে না।'

আর ৪ জুন বিএনপি এমপি হারুনর রশীদের সীমান্ত খুলে দেয়া আর বাংলাদেশ-ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আর কী সব খোলাখুলি হয়েছে এমন বক্তব্যের জবাবে স্বয়ং স্পিকার বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'এটা কী বললেন? কী সব যা তা বললেন? আপনার কি মা-বোন নেই?'

কাফি আরো লিখছে, আমার শহরতলিতে সবারই মা-বোন, বাপ ভাই, চাচা-নানা, মামা-মামী আছেন। কিন্তু তাদের ভেতরে একজনও এমপি নেই!

দোস্ত, হয়ে গেল.....

এতদিন জানতাম যুদ্ধ, প্রেম আর রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। এবার শেষ কথা বলে কিছু না থাকার দলে বাংলাদেশ ফুটবল দলটাও ঢুকে পড়েছে। মালদ্বীপের সঙ্গে হেরে যাওয়ার পর পত্রপত্রিকায় আরো কিছু লজ্জাজনক হারের সম্ভাবনার কথা আগেভাগেই লিখেছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। পরে তাদেরকেই আবার লিখতে হয়েছে 'দীর্ঘ পনের বছরের প্রতীার অবসান-সাফ গেমস ফুটবলে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত সোনা জয়!'

শেষ কথা জানার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকলে বুঝি এমনই হয়। যে ম্যানেজার গাফফারকে নিয়ে খেলোয়াড়দের এতো রাগ-উত্তেজনা, সোনা জয়ের পর খোদ তাকে নিয়েই উল্লাস করেন, ধেই ধেই করে নাচেন জুয়েল রানা। বিজয় সম্ভবত বন্ধু আর শত্রুকে একই আসরে নাচিয়ে ছাড়ে। ভুলিয়ে ছাড়ে সব ভেদাভেদ। ঢাকা চকবাজারের খানদানি ব্যবসায়ী আলহাজ হারুন সাহেব। রেডিওতে খেলা শেষ হওয়ার বাঁশি শুনে তার সামনেই লাফিয়ে উঠল তার কর্মচারী। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে আলহাজ হারুন সাহেব শুধান, আবে ওই কাটা মাগুরের মতো ছটরফটর করছ কেন? তাকে জানানো হলো, সাফ ফুটবলে বাংলাদেশ সোনা জিতেছে।

আলহাজ হারুনের ঝটপট উত্তর ছিল, 'আবে ষাইট কেজি মদু খাওনের ছাইড ইফেক্ট আচে না! শাহবাগ আজিজ মার্কেটের আঁতেল আড্ডার একজন অর্ঘ। সাফ ফুটবলে জেতার পর তার আঁতেল মন্তব্য ছিল, 'ইস আসলাম, মহসিন, কায়সার হামিদ, বাদল রায়দের স্বপ্ন ফর্ম থাকতে পূরণ হলো না। এখন মিলল সোনা। অথচ একটা ফুটবল প্রজন্ম ঝরে গেলো সোনার প্রতীক্ষায়।'

সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে নতুন কার্যক্রম শুরু করা চ্যানেল আই। খেলা শেষ হয়েছে সন্ধা ৭টার পরে। আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল চ্যানেল আই, ফুটবলে সোনা জিতলে সরাসরি প্রতিক্রিয়া দেখাবে তারা। রাত ৮টার পরে প্রচারিত হলো সেই অনুষ্ঠান। খেলা শুরু হওয়ার অনেক আগেই দিনের আলোতে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে মানুষ!

আগে জানতাম টিভির কোনো আনুষ্ঠান না দেখে কিংবা কোনো বই না পড়েই নাকি সমালোচনা লেখা যায়। চ্যানেল আই-এর কল্যাণে বোঝা গেল খেলা শুরুর অনেক আগেই খেলায় জিতে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া জানানো যায়। সেই সব মতামতকে 'সরাসরি প্রতিক্রিয়া' হিসেবেও প্রচার করা যায়!

দুঃখ নিও না 'স্বপ্নলোকের মানুষ'

সাফ ফুটবলে সোনা জেতার পর যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হতো, বাংলাদেশীরা পুজো করতে পারে এমন একজন বিদেশীর নাম বলো। যে কেউ বলতো সামির শাকির। এমন আরো একজন ছিলেন। আইসিসি ট্রফি জয়ের পর তাকে বাংলাদেশী নাগরিকত্ব প্রদান করাও হয়েছিল। স্কটল্যান্ড আর পাকিস্তানকে হারানোর পর যে ক্রিকেট দল বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরেছিল, তখন সেই দলে ছিলেন না সেই গর্ডন গ্রিনিজ।

২৮ বছর বয়সী একটা দেশের ১৫ বছরের হতাশা দূর করে খেলায় জেতার পর আনন্দে যিনি কোনো কথাই বলতে পারেননি, এ দেশে বিদেশী কোচ হিসেবে তিনি অনেকটা নীরবেই নিজের আগ্রহে এসেছেন। তাকে নিয়ে খুব একটা আলোচনাও হয়নি। সাফ ফুটবলে প্রথম সোনা পাওয়ার কৃতিত্বে এখন তাকে নিয়ে হয় তো সবাই সরব। প্রিয় সামির শাকির, আপনার কি কখনো মনে পড়ে গর্ডন গ্রিনিজের কথা? যদি পড়ে, তবে তার পরিণতি জেনে নিজেকে নিয়ে নীরবই থাকুন, এ দেশে আজ যে স্বপ্নলোকের মানুষ, কাল তার অবমাননা করতে অনেকেরই হয়তো কিছুমাত্র যাবে আসবে না।

আপনাকে এমন করে বলাতে কেউ কিছু মনে করছে কিনা জানি না, তবু মনে হয়, বাংলাদেশী খেলোয়াড় আর ফেডারেশনকে খুব ভালো চিনেছেন আপনি।

না হলে যে আপনি জুয়েল রানার মতো অভিমানহত গলায় বলেন, দুই একটা গোল আবারো খেয়ে বসতে পারে, সেই আপনি উচ্ছ্বাস প্রকাশে বাকরুদ্ধ হয়ে যান!

গত পনেরো বছরের ফুটবল ইতিহাসে ব্যর্থতা ছাড়া যখন অন্য কোনো আলোচনা নেই, সফলতার অভিব্যক্তি সেখানে মানুষকে বাকরুদ্ধ করতে বাধ্য।

এবং জুয়েল রানা

সত্তর দশকের শেষে এ দেশ তথা বিশ্বে দারুণ জনপ্রিয় মুষ্ঠিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর কথা মনে আছে আপনার জুয়েল রানা? যে আলীকে মনে হতো অপ্রতিরোধ্য, সেই আলী টাকা আর নামের কাছে অবিবেচকের মতো ধরা দিলেন। ভক্তদের আশাহত করে হারলেন এমন দুটো ম্যাচে, যার আগে তার অবসরে চলে যাওয়াটাই গৌরবের ছিল। সব অধিনায়ক বিজয়ী হন না। কেউ কেউ হন। তাও যদি 'প্রথম' কোনো দারুণ বিজয় হয়, তারপর কি আর সেই অধিনায়কের হেরে যাওয়া চলে?

প্রিয় জুয়েল রানা, আপনার মনে থাকবে তো, যে বিজয় গৌরবে আপনি প্রথম কাঙ্ক্ষিত সোনা বিজয়ের মূল রূপকার তাকে আর হালকা কোনো পরাজয়ে মানাবে না! প্রিয় জুয়েল, আপনার মনে থাকবে তো?

যদি নিজেরা না হারে

ফুটবলার সালাউদ্দীন বলেছিলেন, 'নেপালকে হারানোর সামর্থ্য ও রেকর্ড দুটোই বাংলাদেশের আছে। যদি নিজেরা বড় কোনো ভুল করে না হারে তবে বাংলাদেশকে নেপাল হারাতে পারবে না, হারাতে পারেনি। এক নেপালি সাংবাদিক মন খারাপ করে বলেছে, 'ভাগ্যের জোরে জিতে গেছে বাংলাদেশ।'

আটবারের ভেতর আগের গত পাঁচটি ফাইনালে হেরেছে বাংলাদেশ। তখন কি ভাগ্য তাদের সঙ্গে ছিল না? জিতে গেল, তাই ভাগ্যটা চলে এল বাংলাদেশের পক্ষে?

আসলেই, ব্যর্থ মানুষের কোনো বন্ধু নেই। মানুষেরা পরাজিতদের ভালোবাসে না, মনেও রাখে না। যত পারে, সমালোচনা করে। গোহারা হেরে এবার বাংলাদেশ ফুটবল দল ফিরে এলে তাদের জন্য লজ্জায় মুখ ঢাকতেন সমালোচকের দল। যেটা পড়ে যে-কারো মনে হতে পারতো, ফুটবল খেলোয়াড়রা বুঝি এরশাদ শিকদারের মতো মোস্ট ওয়ানটেড।

স্বপ্নলোকের মানুষ হয়ে ফিরে আসার কারণে ঢোল নিয়ে নামবে রাস্তায়, আর জেতার কৃতিত্ব ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য শুরু হয়ে যাবে কুৎসিত প্রতিযোগিতা। স্বপ্নপূরণের দোহাই দিয়ে হয়তো একজন দেবেন গণভবনে নাস্তা খাওয়ার দাওয়াত, অন্যজন হয়তো বলে বসবেন আমরা সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা না হলে সাফ ফুটবল খেলাই হতো না মাঝখান দিয়ে ক্রিকেট পিচ খুঁড়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা হবে। আবার ধানচাষের উপযোগী হয়ে যাওয়া মাঠে নতুন করে ক্রিকেট পিচ বানানো হবে। এতোসব উল্টাপাল্টা ভুলে গিয়ে জুয়েল রানার দল জিততেও পারে, এই আনন্দের আসলেই কোনো তুলনা থাকা উচিত নয়।

কুফা

বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার সাবেক ফুটবলার আব্দুল গাফফার বলেছেন, প্রথম এই নেপালে ফাইনালে হেরে যাওয়ার ভেতর দিয়ে ফুটবলের কুফা যাত্রা শুরু হয়েছিল। পনেরো বছর পর এই নেপালে ফুটবলের কুফা কাটলো।

জাতীয় সঙ্গীত বাজলো নেপালের মাঠে। নেপালি রাজকুমার সোনা পদক পরিয়ে দেয়া শুরু করলেন বাংলাদেশ দলের সদস্যদের গলায়। পদক 'শর্ট' পড়লো গাফফার যখন রাজকুমারের সামনে দাঁড়ালেন ঠিক তখনই। কী আর করা? মুখে হাসি হাসি ভাব রেখে গাফফার গায়ে জড়ানো জাতীয় পতাকাটা একবার তুলে দেখালো দর্শকদের উদ্দেশ্যে।

প্রিয় গাফফার, শর্ট পড়লো আপনার বেলায় এসে, ব্যাপারটা কী?

সাফ ফুটবলে সোনা জেতার আনন্দে সরাসরি দর্শক প্রতিক্রিয়া চ্যানেল আই গ্রহণ করেছিল সেদিন সকালে। অথচ সেদিন সকালে যদি বাংলাদেশ ফুটবল দল নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করা যেতো তাহলে কেমন উত্তর মিলত? একটু কল্পনা করা যাক—

প্রশ্নকারী : কি ভাই বাংলাদেশ জিতবে আজ?

উত্তরদাতা : বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা তো 'গগন' খেলে। বল মারে বল যায় গোলপোস্টের ১০ হাত ওপর দিয়ে। জিততেও পারে, গোলপোস্ট যদি আসমানে ঠেকান।

প্রশ্নকারী : কী ভাই, জিতবে বাংলাদেশ?

আঁতেল উত্তরদাতা : প্রথমেই আপনাকে বুঝতে হবে 'নেপালের' ভৌগোলিক অবস্থান। নেপালের পাহাড়িদের শারীরিক গঠন। খুঁজতে হবে বাংলাদেশ দলে কোনো

পাহাড়িকে কেন নেয়া হয়নি তার কারণ। যে মাঠে খেলা হবে, সেই মাঠে আগে ক্রিকেট খেলা হতো কিনা সেটাও একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে। আসলে বিভিন্ন ফ্যাক্টর এখানে এতো বেশি ক্রিয়াশীল যে...

প্রশ্নকারী : বাংলাদেশ ফুটবল দল সোনা জিতলে কী অবস্থা হবে?

উত্তরদাতা : খেলোয়াড়রা মাটির দুই ফুট ওপর দিয়ে হাঁটাচলা শুরু করে দেবেন। তাদের পা মাটিতে পড়বে না।

প্রশ্নকারী : সাফ ফুটবলের ফাইনালে দর্শক কেমন হবে?

উত্তরদাতা : দুর মিঞা, এটা কি ব্রাজিল পেয়েছেন যে মাঠে ছন্দময় খেলা আর গ্যালারিতে কঠিন সাম্বা নৃত্য দেখার আশায় টিভি সেটের সামনে লোক বসে থাকবে?

প্রশ্নকারী : ফাইনালে বাংলাদেশ কয় গোলে জিতবে?

উত্তরদাতা : আরে মশাই, বলকে জাম্বুরা ভাবছেন? ফুটবল এমনিতেই গোল, এজন্য বাংলাদেশ দলের একটুও বাড়তি চেষ্টা করতে হবে না।

বাংলাদেশ খেলায় জেতার পর—

প্রশ্নকারী : ওহ, বাংলাদেশ জিতলো, হাউ এক্সাইটিং! আপনার অনুভূতি...

উত্তরদাতা : এটা কোনো এক্সাইটিং ব্যাপার না, গোলপোস্টের সামনে জট লেগেছিল। যানজট, সেশন জট, সুপ্রিম কোর্টের মামলা জটের সঙ্গে বাংলাদেশ যেমন পরিচিত, সেখান থেকে বল গোলে পাঠানো রোনালদোর জন্য কঠিন হতে পারে, আলফাজের জন্য কোনো ব্যাপারই না!

'দোস্ত , হয়ে গেলো'

পাকিস্তানের একদা সামরিক শাসক জিয়াউল হকের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর একটা কুইজ মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল এমন—সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য অন্তত কী দরকার? সবার উত্তর ছিল—বৈধ নির্বাচন। কিন্তু তার আগে কী জরুরি? উত্তর ছিল—অত্যাবশ্যকীয় বিমান দুর্ঘটনা। তেমনি ভারতের সঙ্গে জেতার জন্য কী জরুরি ছিল? উত্তর—টিপুর অত্যাবশ্যকীয় বিমান গতির শট। ভারতের সঙ্গে জেতার পর আনন্দে মত্ত দলের উদ্দেশ্যে দলনায়ক জুয়েল রানার মন্তব্য ছিল—'এতো লাফালাফির কী আছে? আমরা কি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছি?'

হ্যাঁ, চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছি। এরপর আর কী মন্তব্য থাকতে পারে? গোলরক্ষক বিপ্লবকে জড়িয়ে ধরে টিপুর মন্তব্য ছিল, 'দোস্ত, হয়ে গেলো।'

লুকিয়ে বিয়ে করেছিলেন জাতীয় ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার খালেদ মাসুদ পাইলট। আইসিসি ট্রফি জয়ের পর তার বিয়ের ব্যাপারটা দুই পরিবারের মধ্যেই পাকাপাকি হয়ে গেল ।

শোনা যাচ্ছে, খেলোয়াড় ইকবালসহ আরো অনেকে এখন এমন আশাতেই আছেন। এমন সাফল্যের পর এখন নিশ্চয়ই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

অফসাইড ট্র্যাপ

বিমানবন্দর থেকে নেমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নাশতা খাওয়ার পর পল্টন ময়দানে খেলোয়াড়দের গণসংবর্ধনা । কী কী পুরস্কার দেয়া হবে তাদের?

জিয়া বিমানবন্দরের রানওয়ে খুঁড়ে নতুন মাঠ? কুয়াকাটা বিচের জমি—যা আগামী ১০০ বছর পরেও পানির নিচে থাকবে, সেখানে খেলোয়াড়দের জন্য প্লট?

নাকি আবারও একটা সিজন ধরে ফুটবলের কোনো খেলাই হবে না। ২০০০ সালে আয়োজিত লিগের শিরোনাম হবে—শতাব্দীর শেষ ফুটবল লিগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে নতুন শতাব্দীর শুরুতে!

যারা ফেডারেশনে থাকেন, ম্যানেজমেন্টে থাকেন, কেন জানি বিষাক্ত ফাউল করেও তারা পার পেয়ে যান। টোটাল ফুটবল সিস্টেমটা বন্দি হয়ে থাকে অফসাইড ট্র্যাপে।

বিপ্লব, আপনি যদি

আগে তিনি খেলতেই পারেননি। কীভাবে খেলবেন? এর আগে যেবার লিগে খেলেছিলেন, এতোটাই বাজে খেলেছিলেন যে, পরে আর তাকে দলের নিয়মিত তালিকায় রাখা হয়নি। অতিরিক্ত হিসেবে থাকলেও তার ওপর কেউ ভরসা করেনি। সেই তিনি গিয়েছিলেন নেপালে, অনেকটাই ঘুরেফিরে দেখে আসার মেজাজে। হঠাৎ কী যে হলো, পনির থেকেও থাকলেন না। ভরসাহীন তিনি যেন আগলে দাঁড়ালেন। মাঝে শুধু ভেবে নিয়েছিলেন, 'সমস্ত জাতি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কী হয় যদি সামান্য সময়ের জন্য সবটা উজাড় করে দেই।

সেমিফাইনালে আর ফাইনালে তিনি দারুণ খেললেন। হয়ে উঠলেন গোটা জাতির কাছে নির্ভরশীল। বিপ্লব নিজেও ভুলে গেলেন গত ২১ মাস তাকে একটিবারের জন্যও খেলতে নামানো হয়নি।

বিপ্লব, আপনি কি প্রধানমন্ত্রীর কানে কানে একটু বলবেন, ২১ মাস (২১ বছর নয়, এই যা দুঃখ) পর নিজের ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে খেলায় ফিরে এসে কীভাবে জাতির কাছে 'দারুণ নির্ভরশীল' হিসেবে স্থান করে নেয়া যায়?

ইউ সি বি এল
ইউনাইটেড ক্যাডারস ব্যাংক লিমিটেড

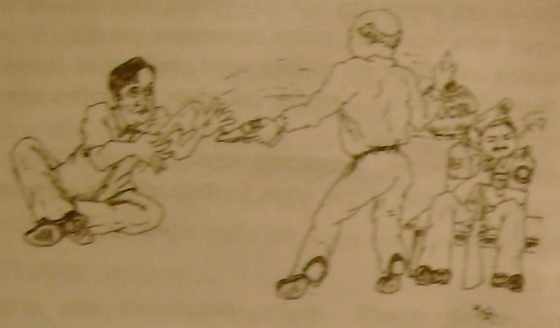

ইসরাইলের জেলে বন্দি কিছু ফিলিস্তিনির মুক্তির দাবিতে একদা বিমান হাইজ্যাক করেছিলেন লায়লা খালেদ। ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পুরোমাত্রায় জড়িত থাকলেও এর কারণে কেউ তাকে মনে করতে চায় না। প্রথম মহিলা বিমান হাইজ্যাকার হিসেবেই তিনি বিখ্যাত হয়ে থাকলেন।

এর আগে খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে অনেকেই বিতর্কিত হয়েছেন এ দেশে। কারো নামের আগে জুটেছে খুনি বা গলাকাটা উপাধি। কিন্তু কখনো ব্যাংক দখলের কাজে কেউই জড়িত হননি বাংলাদেশে। আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক সাবেক এমপি আখতারুজ্জামান বাবু এ ক্ষেত্রে 'পাইওনিয়ার'। ব্যাংক দখলের পথিকৃৎ হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন! বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের পথিকৃত বলা হয় আযম খানকে। পপ গান বা ব্যান্ড সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তুলতে আযম খানের বেশ অবদান রয়েছে। ব্যান্ড সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত অনেকেই এ কারণে আযম খানকে একন গুরু" বলে সম্বোধন করেন।

হল দখল, চর দখল, স্ট্যান্ড দখল, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মতো একদিন ব্যাংক দখলও জনপ্রিয় হবে আশা করি। তখন পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাংক দখলকারীরা আখতারুজ্জামান বাবুকে 'গুরু' বলেই সম্বোধন করবেন ইনশাল্লাহ।

ব্যাংক বাবু

ঢাকা কলেজের ছাত্র আব্দুল্লাহ হিল কাফি আলপিনের ক্যাডার-বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর একটি চিঠি লিখেছে। চিঠির ভাষা এমন-'ক্যাডার যেই হোক বিচিত্র নাম থেকে তার হয়তো বা নেই। তবে সবচেয়ে অবিচারের মুখোমুখি হয় বাবু নামের ক্যাডাররা। অনেক ক্যাডার বাবুর নাম এসেছে। পিচ্চি বাবু, ন্যাটা বাবু, বোমা বাবু, বাটাম বাবু, ছিট বাবু, কিলাই বাবু, হোয়াইট বাবু, জাপানি বাবু,

জামাল বাবু, কিংবা কুত্তা বাবু, ইত্যাদি। এই তালিকায় আরো একজনের নাম যুক্ত হবে। ব্যাংক দখলের কারিশমার জন্য ক্যাডার হিসেবে আখতারুজ্জামান বাবুর নাম হবে এখন থেকে 'ব্যাংক বাবু'।

কাফির কথাটা ফেলে দেয়া যায় না। ব্যাংক দখলের কাজে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত টেরর 'জ্যাক কাদের' আর 'ছিট্টা আকবর'কে। ব্যাংক দখলের এক পর্যায়ে একজন পরিচালককে বিবস্ত্র করে ফেলেছিল বাবু সাহেবের ক্যাডার বাহিনী। '৯৫ সালের হরতাল-অবরোধের দিনগুলোতে একজন সরকারি কর্মচারীকে এমন বিবস্ত্র বা দিগম্বর করে দিয়েছিল ছাত্রলীগের এক ক্যাডার। এমন কারিশমার কারণে সেই ক্যাডার এখনো 'দিগম্বর আলম' হিসেবেই পরিচিতি পায়। ব্যাংক বাবুকে অবশ্য 'দিগম্বর বাবু' বলা যায় কিনা সেটা বিতর্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তবে যেটা নিয়ে একেবারেই বিতর্ক হবে না সেটা হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ইমেজ-বিষয়ক ব্যাপার। বীরের মতো আখতারুজ্জামান বাবু সরকারের ইমেজকে দিগম্বর করে দিয়েছেন।

খুট কেলেঙ্কারি যা পারেনি, কাদের সিদ্দিকীর পদত্যাগ নাটক যা পারেনি, আখতারুজ্জামান বাবু তাই পেরেছেন। আর কেউ খুশি না হোক, খালেদা জিয়া নিশ্চয়ই হয়েছেন!

ইউনাইটেড ক্যাডারস ব্যাংক লিমিটেড

পুরনো একটা প্রবাদ এমন—চুমু দিলে মনে রাখে না মানুষেরা চড় মারলে মনে রাখে। ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কিত।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বিশাল অবদান মানুষেরা নাকি মনে রাখতে চায়নি। দুর্ভিক্ষের ঘটনা, আমার কম্বল কোথায় কিংবা চাটার দল-বিষয়ক ঘটনাগুলো মানুষ সহজে ভোলে না। অর্থনৈতিক সফলতা, ডলারের মূল্যমান চাঙ্গা কিংবা ইরাক কুয়েতের যুদ্ধে আমেরিকার সফলতার পরও নাকি জর্জ বুশকে মনে রাখতে চায়নি মানুষ। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো। ছাত্রী-মিছিলে হামলার পরও ডাকসুতে প্যানেলসহ বিজয়ী হতে পারে ছাত্রদল। মনিকার সঙ্গে এতো রগড়ের পরও ক্লিনটন টিকে থাকেন। দেশ দখল, ঠাণ্ডা মাথায় নিজ জামাতাকে খুনের পরও বীরের সম্মান পান সাদ্দাম হোসেন। এ দেশে সিনেমার নাম হয় বাপের বেটা সাদ্দাম কিংবা সাদ্দাম বাদশা। নবজাতকের নাম রাখা হয় সাদ্দাম।

অনেক কেলেঙ্কারির পরও এরশাদ পাঁচ-পাঁচটি আসনে জেতেন।

এমন চিন্তা করলে আখতারুজ্জামান বাবু নিশ্চয় ঘৃণিত হবেন না বরং ক্যাডার বাহিনী নিয়ে দিনে দুপুরে পুলিশবাহিনীকে নপুংসক করে রেখে ব্যাংক দখলের ঘটনাটি পুঁজি করে নতুন ব্যবসায় নামতে পারে ইউসিবিএল। শুধু ব্যাংকের নামটা পাল্টে ইউনাইটেড ক্যাডারস ব্যাংক লিমিটেড রাখলেই হয়। চক্ষু ব্যাংক, রক্ত ব্যাংক, স্পার্ম ব্যাংক থাকলে ক্যাডার ব্যাংক কেন থাকতে পারবে না?

ক্যাডারদের পুঁজি করে ব্যাংক দখলের মতো বিভিন্ন দখলে 'ক্যাডার ঋণ' প্রকল্প খুব সহজেই হাতে নিতে পারবে পরিবর্তিত ইউসিবিএল। এমনকি দেশের মতো

বিদেশেও 'ক্যাডার রপ্তানি প্রকল্প' লাভজনকই হবে বলা যায়। ভাড়া করা সৈন্যদের নিয়ে আফ্রিকার কোনো কোনো দেশের মতো রাষ্ট্রক্ষমতাই যদি দখল করা যায়, ভাড়া করা ক্যাডারদের দিয়ে তাহলে কেন সুইস ব্যাংক দখল করা যাবে না? প্রিয় পাঠক, একবার ভাবুন তো সুইস ব্যাংক দখলে নিতে পারলে বাংলাদেশের অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে!

আসলে 'ব্যাংক বাবু' বাংলাদেশের সম্পদ। তাকে অক্ষত রাখুন। চড় না মেরে তাকে 'বাচ্চা বাবু'দের মতো চুমুতে চুমুতে ভরে দিন।

চাপা?

ব্যাপারটা হয়তো সত্যি না। স্রেফ চাপাবাজি। তবুও এটা এখন অনেকের মুখে মুখে। ইউসিবিএল ব্যাংক দখলের ঘটনাটা নিয়ে রিপোর্টিঙে দৈনিক প্রথম আলোতে আখতারুজ্জামান বাবুর ছবি ছাপা হয়েছিল। তাকে চিনিয়ে দেয়ার জন্য ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়েছিল— মাঝে 'টাক মাথা'র ব্যক্তি হচ্ছেন আখতারুজ্জামান বাবু (আ. বু)

বাবুর মাথার প্রায় পুরোটাই টাক। অর্থাৎ সেমি ন্যাড়া। সাধারণ পাবলিক ভুল করে তাদের 'আ. বু' ভাবেন কিনা সেই ভয়ে ইদানিং অনেক টাক মাথাওয়ালারই নাকি মাথায় 'উইগ' পরে রাস্তায় চলাচল করছেন।!

মায়া মুকুট

ব্যাংক দখলের পর ব্যাংক বাবু গিয়ে উঠলেন হোটেল সোনারগাঁয়ে। মহান ব্যক্তি বলে চার দিনে তার স্যুট ভাড়া মাত্র তিন হাজার ডলার চেয়ে সোনারগাঁও হোটেল কর্তৃপক্ষ নাকি তাকে বিব্রত করতে চায়নি। এখন তিনি গুলশানে তার পুরনো ঠিকানাতেই থাকছেন। আদালতেও হাজিরা দিয়েছেন। অথচ তাকে, ক্র্যাক কাদের কিংবা ছিঁড়া আকবরকে নাকি পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না। বাবু নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে তার মূল্যবান দুই মিনিটের 'দর্শন' পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও নাকি তার যোগাযোগ আছে। তাহলে পুলিশ তাকে বা তাদেরকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন? কোথায় কোথায় তারা পালিয়ে থাকতে পারেন?

এক. চিড়িয়াখানায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের রহস্যজনক মৃত্যু হচ্ছে! অর্জুন ও মমতার খাঁচা সেখানে খালি আছে। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' হিসেবে বাবু সেখানেই থাকতে পারেন।

দুই. ইউসিবিএল-এর স্ট্রং রুমে (টাকার ভল্ট বা টাকা রাখার গোপন স্থানে)।

তিন. ডিবি অফিসের পানির ট্যাঙ্কিতে।

চার. প্রধানমন্ত্রীর মায়া মুকুটের নিচে।

মায়া মুকুট একটি রূপকথার গল্পের নাম। এক দেশের রাজা মারা গেছেন। রাজকুমার নেই। রাজকুমারী রাজকার্য পরিচালনা করছেন। রাজকুমারীর বিয়ে করা দরকার। তিনি জরুরি 'শাহী এলান' দিলেন। যে যুবক রানীর চোখ এড়িয়ে পালিয়ে থাকতে পারবেন, তাকেই তিনি বিয়ে করবেন।

কেউই পালিয়ে থাকতে পারে না। মায়া মুকুট নামের এক আয়না, সেটায় তাকালে সারা পৃথিবী দেখতে পারেন রাজকুমারী, সেটায় ধরা পড়ে যায় সবাই। শাস্তি হিসেবে যুবকের গর্দান যায়।

অন্য এক রাজ্যের রাজকুমার একবার এক মাছকে বাঁচিয়েছিল। সে মাছের পেটে লুকালো। রাজকুমারী সেটা বলে দিলেন। কিন্তু তার পালিয়ে থাকার স্থানটি ভিন্নতর হওয়ায় রাজকুমারী তাকে একটা চান্স দিলেন। ওই রাজকুমার ততোদিনে জেনে গেছেন মায়া মুকুটের কথা। তিনি সুযোগ পেয়ে লুকোলেন মায়া মুকুটের নিচে। রাজকুমারী তো আর খুঁজেই পায় না। রেগে-মেগে মায়া মুকুট নামের আয়নাটা ভেঙে ফেলার আগেই লুকিয়ে থাকা রাজকুমার বেরিয়ে এসে বললো, 'রাজকুমারী এই যে আমি!'

রূপকথার গল্প এখন আর কেউ বিশ্বাস করে না। আমেরিকায় চৌধুরী সাহেবের যে বিরাট বাড়ি সেখানে কে না থেকেছে দুর্দিনে? চৌধুরী বাবুর এই অবদান রূপকথার মতো, কেউ বিশ্বাস করে না। বাস্তবে মানুষ যা বিশ্বাস করে সেটা প্রধানমন্ত্রীর মায়া মুকুট আছে। ক্ষমতায় এলে এই মায়া মুকুট সবারই হয়। এর নিচে গিয়ে লুকালো?

ওহ্, বাবু দি গ্রেট!

প্রায়শ্চিত্ত

ব্যাংক দখলের পর ক্যাডাররা খুশি হয়েছিল। চৌধুরী বাবুকে গ্রেট ভেবে উজ্জীবিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তার কিছু না হোক, একদিন ক্র্যাক কাদের আর ছিঁড়া আকবরকে যদি পুলিশ ধরে? ক্যাডাররা মনে মনে খানিকটা দমে যায়। ভাবে এর চেয়ে ইউসিবিএল-এর ভল্ট ভেঙে সব টাকা নিয়ে এলেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো। নগদ মিলতো কিছু ক্র্যাক আর ছিঁড়ার। ধরা খেলে তো এখন জেলে পচে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ক্যাডার মাস্তানরা এক সময় ভালো হতে চায়। ভোটে দাঁড়িয়ে বলে, এবার সেবা করার সুযোগ দিন। ভালো হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। সন্ত্রাস থাকবে না এলাকায়। ভয়ে ভয়ে অনেকেই ভোট দেয়। বিচারকরা নাকি ইদানিং ভয়ে থাকেন। তারা ঘোষণা দেন 'আমরা বিব্রত'। যদি আখতারুজ্জামান বাবু প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পান তাহলে তার জন্য কী কাজ বরাদ্দ করা যেতে পারে—

এক. শেখ মুজিবের ছবি সংবলিত নোটের ওপর যারা বাজে কথা লিখেছে, ছবি বিকৃত করেছে, সেই ছবি বা লেখা 'ইরেজার' দিয়ে ঘষে ওঠানোর কাজ।

দুই. বাংলাদেশের ঋণখেলাপিদের শুদ্ধ, সঠিক ও দীর্ঘ তালিকা প্রণয়নের কঠিন কাজ।

তিন. মিরপুর বধ্যভূমি খননের কাজ (নিজ হাতে)।

চার. ইউসিবিএল-এর শুদ্ধতার জন্য এর নতুন যেকোনো শাখা নির্মাণের সময় পাইলিঙের কাজ (নিজ হাতে)।

পাঁচ. ইউসিবিএল-এর এ যতো টাকা জমা আছে, সব টাকা চার-আট আনার কয়েনে রূপান্তর করে সেগুলো গুনতে দেয়ার কাজ।

ধর্মের গীত

নিজাম ডাকাতের কাহিনী অনেকেই জানেন। বেঁধে রেখে যার কাছ থেকে টাকা নেবেন, ডাকাতি করবেন, সেই পথিক বনের মাঝে নিজামকে শুধায় আপনি এই টাকা নিয়ে

যাদের ভরণপোষণ করবেন তারা কি আপনার এই পাপের দায় বহন করবে? নিজাম শুধালেন অবশ্যই। পথিককে বেঁধে রেখে বাসায় ফিরে জানতে পারেন কেউ তার পাপের দায়ভাগে নেবে না। পিতা হিসেবে ভরণপোষণের দায়িত্ব তার। সেকথা ঠিক। কিন্তু কেউ তো তাকে বলেনি যে ভরণ-পোষণের টাকা ডাকাতি করে যোগাতে হবে। ফিরে এসে বেঁধে রাখা পথিককে ছেড়ে দিলেন নিজাম। তিনি হলেন আউলিয়া।

ধর্মের এই কাহিনীকে রূপকথা মনে হতে পারে। রূপকথা মনে হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর নেকাব পরা, তজবিহ গোনা, নামাজ পড়ার দৃশ্য কিংবা দাড়ি-টুপিওয়ালা আওয়ামী নেতাদের বদলে যাওয়া লেবাস্। বাস্তব অন্যরকম। ঘুষখোর, কালো টাকার মলিক, ঋণখেলাপি, ব্যাংক ডাকাতদের ছেলেমেয়েরা এখন এসব কিছুর সুবিধা কিংবা ক্রেডিট নেয়, দায়ভাগ আবার কী?

ধরে নিই, যদি শুধু বাবু চৌধুরীর টাকাতেই চলে পুরো আওয়ামী লীগ দল তাহলেও কি হুমায়ুন জহির হত্যার মতো এই ব্যাংক ডাকাতির দায়ভাগও নিতে যাচ্ছে তারা? ধর্মের কাহিনী যেহেতু রূপকথা, বর্তমান বাস্তবতা তাহলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দায়ভাগ নেয়া?

যারা বলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী, তাদের মুখ বন্ধ করে না দিলে শান্তি নেই!

নমস্য দুজন

চট্টগামের আনোয়ারার আইলধর ইউনিয়নের একদা চেয়ারম্যান আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু যৌবনে আলকাতরার ব্যবসা করতেন। প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ী বা দলের মুখে আলকাতরা ছুড়ে দিয়ে নিজের লাভটা তখন থেকেই ভালো বুঝতেন বাবু। আওয়ামী লীগের এমপিও হয়েছিলেন। কিন্তু আলকাতরার কালো রং আনোয়ারার চোরাচালান কিংবা কালো টাকাকে বঙ্গবন্ধু পছন্দ করেন নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের যে চারজন এমপিকে বঙ্গবন্ধু নিজেই বহিস্কার করেছিলেন দল থেকে, বাবু চৌধুরী তাদের একজন।

তবু বাবু চৌধুরী দলে ফিরতে পেরেছিলেন। কালো টাকা কিংবা বন্দুক দুটোর ব্যবহারই তিনি ভালো জানেন। ঋণখেলাপীও হয়েছেন। তবু তার কিছু হয়নি। হওয়া উচিতও নয়। একাধিক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বলেছে তিনি একই রকম দুটো পাজেরো জীপ একই সময়ে উপহার দিতে পেরেছিলেন শেখ হাসিনা ও এরশাদকে। আমরা অনেকেই এমন উপহার দিতে পারি না। বিচারকরাও এমন অনেক কিছু করতে পারেন না। তবে সুখের কথা, সন্ত্রাসী যেই হোক আওয়ামী লীগ তাকে শাস্তি দেয়—সেঞ্চুরিয়ান 'মানিক' ছাত্রলীগ থেকে 'বহিস্কৃত' হওয়ার শাস্তি পেয়ে দূরদেশে যেতে পেরেছে। আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত হয়ে এখন আকতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুও হয়তো আমেরিকা যাবেন।

দেশের কর্মহীন যুবকেরা আমেরিকা যেতে চাইলে ছাত্রলীগ বা যুবলীগে যোগ দিন। তারপর মানিক বা বাবুকে অনুসরণ করুন।

রূপকথার রাজা

'৮৯ সালের ঘটনা। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সপ্তাহ চলছে। 'রসাত্মক গল্প বলা' প্রতিযোগিতার জন্য মঞ্চে এলো এক ছাত্র। তার নাম জুলকার নাইন। সে তার গল্প বলা শুরু করলো :

আমি ইংরেজিতে একটু কাঁচা ছিলাম। ইংরেজি শিখতে যেতাম এক শিক্ষকের কাছে। অবশ্য শেখার চেয়ে স্যারের সুন্দরী মেয়েটাকে দেখাই তখন আমার কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিল। সে যাক। স্যার আমাকে অনেক ট্রান্সলেশন শিখিয়েছিলেন। এই যেমন 'তোমরা কি কখনো হাজি মোহাম্মদ মোহসীনের নাম শুনিয়াছ? তিনি একাধারে বিদ্বান, প্রজাহিতৈষী এবং দানশীল ছিলেন।' আমি যেদিনের কথা বলছি স্যার সেদিন অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি বললেন আমি নিজে যেন মন মতো কয়েক লাইন বাংলার ইংরেজি করে আনি। আমি ট্রান্সলেশনের জন্য কয়েক লাইন লিখলাম ঠিক এভাবে-'তোমরা কি কখনো আলহাজ্ব হোসাইন মোঃ এরশাদের নাম শুনিয়াছ? তিনি একাধারে দয়ালু, দানশীল, গলফ খেলোয়াড়, কবি এবং সর্বোপরি 'হাজাম' ছিলেন। কারণ তিনি সর্বপ্রথম দশ কোটি বাংলাদেশীকে ২য় বার মুসলমানির মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে ঘোষণা করেছিলেন।' এরশাদ আমলে পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার মতো সেবার জুলকার নাইনকেও প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল।

রাশির প্রভাব

গোলাম আযম 'অধ্যাপক'। আবার আমাদের তথ্য প্রতিমন্ত্রীও 'অধ্যাপক'। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক অধ্যাপকের কাছে ছাত্রদল করা আমার এক বন্ধু যেতো চাঁদা আনতে। আমিও আমার বন্ধুর সঙ্গে স্বঘোষিত সেই অধ্যাপকের কাছে

গিয়েছিলাম। চাঁদাবাজি করতে নয়, স্রেফ হাত দেখাতে। প্রফেসর সাহেবের কথা শুনে আমি আশাহত হয়েছিলাম। আমার নাকি রাশি খারাপ। আমার মন খারাপ হওয়া দেখে প্রফেসর সাহেব আশার বাণী শুনিয়েছিলেন—রাশি খারাপ বলে মনমরা হওয়ার দরকার নেই। চেষ্টা করে যান, রাশি খারাপ নিয়েও অনেকেই অনেক কিছু করে খাচ্ছে। এরশাদ সাহেবের ব্যাপারটাই দেখুন না। তার চেয়ে বড় 'রাশি খারাপ-এর উদাহরণ আর কী হতে পারে?'

এরশাদের প্রসঙ্গ এলেই আমার হাত দেখা অধ্যাপকের কথা মনে পড়তো। মানুষ হত্যা, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, নারী কেলেঙ্কারী এসব এরশাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই লোকে তাকে খারাপ বলতো। অথচ খোদ বিল ক্লিনটন একাধিক নারী কেলেঙ্কারির পরও টিকে গেলেন। জিয়াউর রহমানও সামরিক শাসক ছিলেন। তাকে অনেকেই মহান ভাবেন। অথচ রাশি খারাপ যেন শুধুই এরশাদের!

কেউ কথা রাখেনি

ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় এরশাদ কথা রাখতেন না। '৮৬-র নির্বাচনের তারিখ, উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ১০ বার করে পেছানো, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা অতপর দুর্নীতিবাজ সাজাপ্রাপ্তদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ঘোষণা আবার তাদের হত্যা, চাকরিচ্যুত করা—এরশাদের এ রকম কথা না রাখার 'দুমুখো সাপ মার্কা কাজের বহু উদাহরণ দেয়া যাবে।

তার এই কথা না রাখা তার পদবির সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, ইংরেজিতে বলা হতো সিএমএলএ (চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)। কথা না রাখার নজির হিসেবে সিএমএলএ মানে দাঁড়ালো—'ক্যানসেল মাই লাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট!'

এরশাদ খুব ভাগ্যবান। তিনি নিজেই শুধু কবিতা লিখতেন না। তাকে নিয়েও প্রচুর কবিতা লেখা হয়েছে। সেগুলো খ্যাতি পেয়েছে। তার জন্য যতোগুলো হরতাল, গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, অন্য কারো জন্য তেমন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। '৮২ থেকে '৯০ পর্যন্ত তো রেওয়াজ হয়েই গিয়েছিল যে, এরশাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় না নামলে কেউ নেতা হতে পারবে না। তার বিরুদ্ধে এক কলম না লিখলে কেউ লেখক হতে পারবে না। তার বিরুদ্ধে কবিতা না লিখলে কেউ কবি হতে পারবে না। তার বিরুদ্ধে কোনো পত্রিকা না লিখলে তার কাটতি বাড়বে না। অনেকেই লেখক, কবি, নেতা, সম্পাদক হয়েছেন কিন্তু কেউ 'এরশাদ' হতে পারেননি।

চামচা মেকার

এরশাদ সুন্দর 'চামচা' তৈরি করতে জানতেন। তার চামচারা বক্তৃতায় বলতো বঙ্গোপসাগরের সব জল যদি কালি হয় আর সুন্দর বনের সব গাছকে যদি কলম বানানো যায়, তবু এরশাদের গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না! এরশাদের মা'র মৃত্যুর পর শাহ মোয়াজ্জেম আর কাজী জাফরের কান্না দেখে নাকি এরশাদ নিজেই লজ্জা

পেয়ে গিয়েছিলেন। শাহ মোয়াজ্জেম তো স্বীকার করেছেন, যতো বার তিনি এরশাদ এরশাদ করেছেন, ততো বার নাকি আল্লাকে ডাকলে তিনি অলি আউলিয়া হয়ে যেতেন।

ফ্যান্টাসি!

বঙ্গভবনে বসে আছেন এরশাদ। তার সঙ্গে আছেন শামসুল হুদা। টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এলো। এরশাদ শামসুল হুদাকে বললেন, 'আসুন শেয়ার করি।'

শামসুল হুদা বললেন, 'কে খাবার পাঠিয়েছে?'

এরশাদ ভিরমি খেলেন। বললেন, কেন তাকেও শেয়ার করতে চান বুঝি? ওহ নো, আপনি পারবেন না, বয়স হয়ে গিয়েছে তো। তাই খাবার কে পাঠিয়েছে তার নাম আপনার না জানলেও চলবে।

খাবার যিনি পাঠিয়েছিলেন তিনি একজন মহিলা সাংসদ। এরশাদের সঙ্গে তার কঠিন প্রেমটা শেষমেশ ভেঙেই গেছে।

রিকশায় করে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আছেন সে সময়ের ('৯১ সালের ঘটনা) পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর জাহাঙ্গীর ভাই। তিনি তার একটি স্মরণীয় ঘটনা জানালেন।

এরশাদ গাড়িতে 'টিনটেড' গ্লাস ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। একদিন রাত পোনে ২টায় তিনি দেখলেন এমন টিনটেড গ্লাসের একটি গাড়ি যাচ্ছে। মোটর সাইকেল নিয়ে তিনি গাড়িটির পিছু ধাওয়া করলেন। শাহবাগ থেকে চেজ করে সোনারগাঁ হোটেলের সামনে এসে তিনি গাড়িটির পথ আগলে দাঁড়ালেন।

টিনটেড গ্লাস খুলে গেলো। যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি ছিলেন তখনকার ডিজিএফআই এর প্রধান। তার এক হাতে স্টিয়ারিং অন্য হাতে উদ্যত পিস্তল। গাড়ির পেছনের সিটে এরশাদ এক সংবাদ-পাঠিকার সঙ্গে বসা। জাহাঙ্গীর ভাই দুঃখ করে বললেন, 'এই লোকটা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছে, নয় বছর দেশ শাসন করেছে!'

রিকশা থামলো। আমি ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। রিকশাওয়ালা বললো, 'ভাই আমার বাড়ি রংপুর। আমি এরশাদকেই ভোট দিয়েছি, এরপর দেবো। রাজা-রাজরারা এমন একটু মজা করেই, প্রজাদের সেগুলো মনে রাখতে নেই।'

বন থেকে দাতাল শুয়োর, রাজাসনে বসবেই!

জাতিসংঘে রাষ্ট্র প্রধানদের অধিবেশনে হঠাৎ করে এক পাগল ঢুকে পড়ল। একটা চেয়ার দখল করে সে উল্টাপাল্টা বক্তৃতা শুরু করে দিলো। পাগলটাকে কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। অনেক রাষ্ট্রপ্রধান পাগলটাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। সে সময়কার সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ, আমেরিকার রোনাল্ড রিগ্যানের চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। এগিয়ে গেলেন সে সময়কার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান লে. জে. হো. মো. এরশাদ। পাগলটা অধিবেশন ক ছেড়ে পালালো। সবাই জানতে চাইলো ব্যাপারটা কী? কী এমন জাদু করলেন এরশাদ? এরশাদ বললেন, তেমন কিছু না। আমি পাগলটার কানে কানে বলেছিলাম, 'তুমি কি দয়া করে আমার লেখা (?) একটা কবিতা শুনবে?'

এরশাদের শাসনামলে তাকে ঘিরে যতগুলো কৌতুক প্রচলিত ছিল, এটি সেগুলোর জনপ্রিয়তম। পাগল তার কবিতা শুনতে না চাইলেও এ দেশের প্রধানতম এক কবি বিখ্যাত একটি সাপ্তাহিকে তার নির্বাচিত কবিতাসমূহে এরশাদের কবিতা ক্রমাগত ছাপাতেন। তাকে ঘিরে কবি (?) স্তাবকরা বঙ্গভবনে কবিতা পাঠের আসর বসাতো। ক্ষমতা দখলের পর প্রতিবেশী একটি দেশের এক বাজার কোম্পানি তাকে নিয়ে ঢাউস আকৃতির একটি ফিচার ছাপিয়েছিল যার শিরোনাম ছিল 'বন্দুকের নলের ডগায় প্রজাপতি'।

অথচ কবিতা আকারে এরশাদের ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে প্রথম যে কবি এগিয়ে এসেছিলেন তার নাম মোহাম্মদ রফিক। তিনি লিখেছিলেন, 'সব শালা কবি হবে/পিপীলিকা গো ধরেছে উড়বেই/বন থেকে দাঁতাল শুয়োর/রাজাসনে বসবেই!' ফলাফল হয়েছিল ভয়াবহ। মোহাম্মদ রফিককে জলপাই রঙের জিপে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টে। রংপুরের এক জনসভায় সম্প্রতি মহান এরশাদ বলেছেন, 'ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হব আমি, অথবা শেখ হাসিনা।'

প্রিয় পাঠক, আগামী এক বছর পর এই মানুষটি যদি আবার মতায় এসে কবিতা লেখা শুরু করেন, তাহলে দেশবাসীকে এবার হয়তো পাগল হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে!

মৃত্যুদাতা শ্রেষ্ঠতম ক্যাডার

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জেনারেল এরশাদ পশ্চিম পাকিস্-ানে কর্মরত ছিলেন। মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে দু-দুবার ছুটিতে এসেছিলেন এ দেশে। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়াতে চাননি। '৭৩-এ দেশে ফেরার পর চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করার সোর্স হিসেবে এরশাদ যাকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, তার নাম নাজিউর রহমান মঞ্জু! এরশাদকে দেশে ফিরে চাকরিতে রাখার ঝুঁকি অনেকেই নিতে চাননি। পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ায়, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে। প্রশিক্ষণের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল সেটা অনেকে না জানলেও এ তথ্য অনেকেরই জানা যে হঠাৎ করেই '৭৫-এর জুলাই-আগস্টে এরশাদ সাহেব দেশে ফিরে এসেছিলেন। এরপর কিন্তু বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন।

ক্ষমতায় থাকাকালীন বেগম খালেদা জিয়া অনেকবার নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকারী হিসেবে এরশাদকে অভিযুক্ত করেছেন। মেজর জেনারেল মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডেও এরশাদ অভিযুক্ত হয়ে আছেন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের নয় বছরে পুলিশ কিংবা এরশাদের পেটোয়া বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল কমপক্ষে ৩৫১ জন মানুষ। আর ভোটারবিহীন নির্বাচনী সন্ত্রাসে নিহত হয়েছিল কমপক্ষে ২০০০ মানুষ। (*রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র* : মুস্তফা মজিদ।)

তবু কিন্তু কোনো না কোনোভাবে শেখ হাসিনা অথবা খালেদা জিয়া এরশাদের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে ক্ষমতায় থাকতে বা যেতে চেষ্টা করেছেন। এখনো করছেন।

কারণটা কী? চিফ হুইপের ছেলে হয়ে সামান্য বাড়ি দখল করলে বদনাম হয়। এমপির ছেলে হয়ে খুনের ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়লে ইজ্জত যাবে। মন্ত্রীর ছেলে হয়ে মার্কেট দখল করলে সমাজে ছিঃ ছিঃ পড়ে যায়।

তার চেয়ে কি বীরাপ্পনই ভালো নয়, যে কমপক্ষে ১২১টি খুন করার পরও একালের রবিনহুড খ্যাতি পায়? সুতরাং যার আমলে কমপক্ষে ৩৫১ জন নিহত হয় সে কি বীরাপ্পনের চেয়েও মহান মৃত্যুদাতা নন? আর তিনি যদি বন্দুকের জোরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মতো সাহস দেখান, তবে কি তিনি সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্যাডার নন? সুতরাং একজন ছাত্র যদি ছাত্রাবাসের একটি সিটের বরাদ্দ পেতে একজন ক্যাডারের সাহায্য নিতে পারেন, তাহলে আগামী এক বছরে হাসিনা ও খালেদা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যদি এই শ্রেষ্ঠতম ক্যাডারের কাছে বার বার ছুটে যান, তাহলে কি জনগণ অবাক হবেন?

কে হায়, নূর হোসেনের রক্ত দিয়ে 'অবাক হইনি' লিখতে ভালোবাসে?

জন্মদাতা

একদা যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান হুট করে এরশাদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে এসেছিলেন। স্থায়ী ছিলেন মাত্র নয় মাস। প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানোর পর তিনি এক চমকপ্রদ বই লিখেছিলেন যার নাম *প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস*। এই বইয়ের ২৯ পাতায় আছে : 'খবরের কাগজে এরশাদের পুত্রসন্তান হইয়াছে পড়িয়া অবাক হই। তিন চারদিন আগে বঙ্গভবনের মাঠে এক চা-চক্রে রওশন এরশাদকে দেখিয়াছিলাম। তখন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। দুই চার দিন পর সদ্যোজাত শিশুর ছবি টেলিভিশনে দেখানো হইল। বেশ বড়সড় কয়েকমাসের বাচ্চা বলিয়া মনে হইল।...পরবর্তীতে দেখা যায় এই শিশুটিকে নিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিশ্বব্যাপী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে...।'

আতাউর রহমান খানের *প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস* বইতে নির্বাচন নিয়েও কিছু মন্তব্য আছে। যেমন, কাজী জাফর আহমেদ বলিলেন নির্বাচনে দাঁড়াইতে হইবে। আমি বলিলাম, বয়স হইয়াছে। টাকা-পয়সাও তেমন নাই। তিনি বলিলেন, আপনি শুধু দাঁড়াইবেন, ঢাকাতেই থাকিবেন, কিছু করিতে হইবে না। পাশ করাইয়া আনার দায়-দায়িত্ব আমার।'

হ্যাঁ, এরশাদ সাহেব ভৌতিক ভোটেরও জন্মদাতা ছিলেন। ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ তিনি যে গণভোটের আয়োজন করেছিলেন, শতকরা পাঁচ ভাগ ভোটারের উপস্থিতি না থাকলেও তিনি পেয়েছিলেন শতকরা ৯৪.১৪ ভাগ ভোট! জনদল কিংবা জাতীয় পার্টির জন্মদাতাও ছিলেন তিনি। এছাড়া কখনো জেলা পরিষদ, কখনো উপজেলা আন্দোলন, পল্লী পরিষদ, যুব কল্যাণ পরিষদ, ভূমি সংস্কার, ওষুধ নীতি এসব ধরনের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও আদর্শের জন্মদাতা ছিলেন এরশাদ। কোনো কিছুতেই তার জনবিচ্ছিন্নতা কাটেনি। বৈধতা মেলেনি। প্রিয় পাঠক, অপেক্ষায় থাকুন। আগামী এক বছরে এরশাদ আরো অনেক ঘটনার জন্ম দিতে পারেন। সেই ঘটনার বৈধতা দিতে শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়া কাউকে না কাউকে আপনারা এরশাদের পাশে পাবেন!

টেক্কা

১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সিনিয়র আর্মি অফিসারদের এক বৈঠক ডাকলেন সে সময়কার সশস্ত্র বাহিনী প্রধান লে. জে. হো. মো. এরশাদ। দেশের সংকটজনক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তারপর কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার, মেজর জেনারেলদের জানালেন কেন তিনি ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছেন। তারপর একটি কোরআন শরিফ ছুঁয়ে সবাইকে বললেন বিশ্বাস করুন, আমার কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ নেই।

ক্ষমতা দখলের পরে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে একাধিক বক্তৃতায় এরশাদ সাহেবই বলেছিলেন, তিনি সৈনিক, সৈনিকই থাকতে চান। তিনি রাজনীতিবিদ নন, তার কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাশা নেই! দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার পর বিভিন্ন দলের নেতা-উপনেতা-পাতি নেতাদের ধরে জেলে পুরেছিলেন। তবে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ নেতারা জেল থেকে বেরিয়ে মন্ত্রী হয়েছিলেন এরশাদের মন্ত্রীসভার। নিজের আত্মার সন্তান বলে যাকে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই আযম খান প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজউদ্দীনকে।

ব্রিটিশরা যেভাবে দেশ শাসন করতো, তার নাম দেওয়া হয়েছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল। আর এরশাদের শাসনকালকে বলা হয়েছে ডেস্ট্রয় অ্যান্ড রুল। আসলে এরশাদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি খুবই দক্ষ হাতে সমগ্র জাতির চরিত্র হননের কাজটি সুচারুভাবে করতে পেরেছিলেন।

আসলে উকিল এবং কথাশিল্পী দুজনেই মিথ্যা অথবা অর্ধসত্যকে পূর্ণ সত্যের মতো করে উপস্থাপন করেন। শুধু বাংলাদেশে এ দুটি শ্রেণীকে হারিয়ে দিয়েছেন রাজনীতিবিদরা। তবে রাজনীতিবিদদের মধ্যে সবাইকে টেক্কা দিতে পেরেছেন একমাত্র এরশাদই।

আগামী এক বছরেও তিনি আরো এমন অনেক টেক্কা দিতে পারেন। প্রিয় পাঠক, মনোযোগের সঙ্গে খেয়াল রাখুন!

আপনি কী?

এরশাদের কবিহৃদয় কেমন ছিল? তিনি খুব ভালো কাঁদতে পারতেন। তার কথিত দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়ম মেরী বিদেশী পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন এরশাদ তার দুঃখের কথা বলতে গিয়ে প্রায়শই কেঁদে ফেলতেন। ফালানীর চরিত্রে অভিনেত্রী ঈশিতার অভিনয় দেখে দারুণভাবে কেঁদে ফেলেছিলেন মহান এরশাদ।

স্টান্টবাজিও কম জানতেন না। জ্বালানি খরচ বাঁচাতে তিনি মাত্র একদিন সাইকেলে চড়ে অফিসেও এসেছিলেন। মাত্র একদিনের জন্য আবুল হাসনাতকে ঢাকার মেয়র বানিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন।

'কথা দেওয়া যায়, কথা তো যায় না রাখা'—কবি হিসেবে এই আপ্তবাক্য এরশাদ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। নানা অজুহাতে মাত্র ১১ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি পরিবর্তন করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে ভোটারবিহীন এক মহা নির্বাচনী তামাশার জন্ম দিয়েছিলেন, যা সকল দেশের সকল কালের অবাক হওয়ার রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছিল। ৯ বছরে মাত্র ৬০ বার মন্ত্রিসভা রদবদল করার বিশ্বরেকর্ড একমাত্র এরশাদেরই আছে।

তার আমলে কিছু অন্য রেকর্ড গড়ে উঠেছিল। যেমন হরতাল, পৌনে চার হাজার ঘণ্টার হরতাল। ১৯৮৮ সালে ৬৭ দিন, ১৯৮৯ সালে ২৩৯ দিন হরতাল হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন তিনি বন্ধ করে রাখতেন, যার নাম হয়ে গিয়েছিল 'এরশাদ ভ্যাকেশান'।

আপনি কি আগামী এক বছর পর এরশাদ ভ্যাকেশান কাটাতে চান? তাহলে দয়া করে অপেক্ষা করুন!

শ্রেষ্ঠ হাজাম

রাষ্ট্রের তেল খরচ করে সর্বাধিক বিদেশ ভ্রমণ, জনসভা, জনসংযোগের পর যে কারণে এরশাদ সবচেয়ে বেশি হেলিকপ্টারের তেল পুড়িয়েছিলেন, সেটা আটরশি গমন। তার আটরশি গমন নেশায় পরিণত হয়েছিল।

জন্মদান নিয়ে যে তিনি বিতর্কিত হয়েছিলেন, মাত্র এক টাকার বিনিময়ে তার আমলে ডিমপড়া দিয়ে সন্তানদানখ্যাত সায়েদাবাদী হুজুরকে খোদ ঢাকায় বিরাট জমি দান করেছিলেন। পনের দিন ধরে গোয়েন্দারা কোনো স্থান চষে 'নিরাপত্তা' ঠিক করার ঠিক পরদিন এরশাদ সেখানকার মসজিদে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আপনাদের এখানে নামাজ পড়তে এসেছি। তাই চলে এলাম।' (বলুন, নাউজুবিল্লাহ)

যে তিনি রাতের বেলা একজন সংবাদ-পাঠিকাকে নিয়ে নৈশভ্রমণে বের হন, যার সঙ্গে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে হোটেল শেরাটনের ডান্স ফ্লোরে খোদ আজিজ মো. ভাই-এর টক্কর লাগে, সেই তিনি কিনা এ দেশের তাবৎ মুসলমানদের দ্বিতীয়বার মুসলমানির মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে ঘোষণা করেন!

বিদেশী নীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নতজানু পররাষ্ট্রনীতির ধারক। বিদেশী রাষ্ট্রের খবরদারি মাথা নুয়ে পালন করতে বাধ্য হতেন, কারণ তার সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ছিল শূন্যের কোঠায়। কবিতা, নারী আর ক্ষমতার জন্য '৯০-এর ৪ ডিসেম্বর পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েও সময়ক্ষেপনের নীতি নিয়েছিল এরশাদ। উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীকে দিয়ে পুনরায় সামরিক শাসন জারি, প্রয়োজনে দেশজুড়ে আবারও রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া। (এরশাদের শেষ দিনগুলো : মতিউর রহমান) একই সঙ্গে পালানোর জন্য তিনি রেডি করে রেখেছিলেন বোয়িং বিমান।

নয় বছর তাকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানো যায়নি।

হায়, আগামী এক বছর পর না জানি জনগণের কপালে কী দুর্ভোগ আছে!

ক্ষমতার স্বপ্ন

এক নাপিত। এরশাদের চুল কাটতো। চুল কাটার সময় প্রায়ই বলতো, স্যার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর কি? ছাত্র আন্দোলনের কথা শুনলেই নাকি এরশাদের চুল খাড়া হয়ে যেত। নাপিতের তখন চুল কাটতে সুবিধা হতো। এখন যুগ বদলেছে। খালেদা জিয়ার রাজত্বকালে যে নাপিত চুল কাটতো, সে নাকি জিজ্ঞাসা করতো, স্যার আপনার মামলা ও জামিনের খবর কী? অমনি নাকি এরশাদের চুল খাড়া হয়ে যেত। সময় আরো বদলেছে। এখন এরশাদের কথা শুনলেই নাকি অনেকের চুল খাড়া হয়ে যায়। আর ক্ষমতার স্বপ্ন তার কখনই ভেঙে চুরমার হয় না।

আর তাই তিনি আশায় দিন গোনেন। একদিন আবারও তিনি ক্ষমতায় যাবেন। লিখবেন কবিতা, টেলিভিশনে বাজবে গান। হাজারও মানুষের ভিড়ে মঞ্চে উঠবেন, মালার ভারে নুয়ে পড়বে তার গলা, তিনি গুনবেন এবং অগত্যা বলে ফেলবেন, 'পঞ্চাশটা মালার দাম দিয়েছিলাম, উনপঞ্চাশটা গলায়, বাকি একটা কই?'

তবু মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে যাবে। ভিড় করবে সেলিম দেলোয়ারের মুখ। তাকে তোলপাড় করে দেবে নূর হোসেনের মৃত্যু-আকুতি। ভেসে উঠবে অসংখ্য শহীদের স্মৃতি। রাতে তার ঘুম হবে না। তবু পরদিন সকালে তিনি অভ্যাসবশত দৈনিক পত্রিকা খুলে বসবেন। মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। সেখানে লেখা হয়েছে, 'দীর্ঘ দশ বছর পরেও স্বামী হত্যার সুবিচার না পেয়ে একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ডা. মিলনের স্ত্রী রাগে-ক্ষোভে-নিদারুণ দুঃখে শেষমেশ আমেরিকা পাড়ি জমাচ্ছেন।'

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরে তিনি ঐতিহাসিক ক্যাসেট কেলেঙ্কারীরও জন্ম দিলেন। সে কারণে এক বিচারপতির নাম হয়ে গেল ক্যাসেট লতিফুর রহমান। জনতা টাওয়ার মামলায় তিনি আবারও জেলে গিয়েছেন। আগে জেলে থাকা অবস্থায় তার লাগানো বড়ই গাছটা কত বড় হয়েছে, তিনি আবারও কবিতা লেখা শুরু করেছেন কিনা, সে সব এখনও জানা যায়নি।

স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভাঙার দিন

চিত্রশিল্পী শামীম শিকদার শেখ হাসিনা বিরোধীদলে থাকাকালে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'শাড়ি পরে মুভ করা যায় নাকি? প্রধানমন্ত্রীকেও বলেছি, শাড়ি পরা ছেড়ে দিন। শার্ট-প্যান্ট পরুন।'

২০০০ সালের জুলাই মাসে চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে আটজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের এক বিশাল জনসভায় সদম্ভে বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ কি মরে পচে গেল নাকি? আপনারা কি শাড়ি চুড়ি পরে বসে আছেন?'

শাড়ি-চুড়ি পরে বসে থাকলে বোধহয় খুন হয়ে যেতে হয়। কারণ শাড়ি পরে মুভ করা যায় না, পালাবেন বা আত্মরক্ষা করবেন কীভাবে? সুতরাং মতাসীন আওয়ামী লীগের শেষ বছরটায় শেখ হাসিনা যদি মাথার স্কার্ফ ও ঘোমটা, হাতের তসবি ফেলে দিয়ে শার্ট-প্যান্ট পরে ঘোরাঘুরি করেন, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না!

নিজস্ব গতি

বিচার ব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করায় এর আগে একবার আদালত প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়েছিল। বিচার ব্যবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবারও বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। বলেছেন, বিচার বিভাগেরও জবাবদিহিতা থাকা উচিত। প্রশ্ন তুলেছেন, জননিরাপত্তা আইনে বিএনপি সাংসদ মজিবর রহমান সরোয়ারের আগাম জামিন কি আইনসঙ্গত হয়েছে? এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ফ্রিডম সোহেল, কামাল পাশা (কার আশ্রয়ে সে ছিল, বোধ করি সেটা প্রধানমন্ত্রী ভুলে গিয়ে থাকবেন) বোমা মোক্তার ও সুব্রত বাইন শুভ্রর জামিনের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের অপরাধেরও বিবরণ দিয়েছেন। প্রখ্যাত যে ১১ জন আইনজীবী তার মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাদের 'ওরা ১১ জন' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি বোমা মোক্তারের অপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন। আওয়ামী এমপি বোমা মানিকের কথা উ"চারণও করেননি। উল্টো মানিকের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে খোদ আপনিই একসময় বলেছিলেন, মানিককে আমি দোষ দিই কীভাবে? কারণ যখন তার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, তখন মানিক আমার পাশেই ছিল!

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার দলের নেতা আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের 'জেনার'

হিসেবে খ্যাত আখতারুজ্জামান বাবু খুনের মামলার জামিন ভেঙে বিদেশে পালিয়েছিলেন। আপনি ক্ষমতায় আসার পর বাবু দেশে ফিরে এসে মাত্র একদিনের ভেতর নিম্ন আদালতে (বিচার-ব্যবস্থাকে যেখানে নিচে নামানো যায়) জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন। কীভাবে? প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি? ব্যাংক দখলের পরও কেন তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি, সে প্রশ্ন কি জাতির বিবেকের কাছে রাখবেন? নাকি শুধু আপনাকে ও আপনার ঐকমত্যের (!) সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা (?) ও সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত এরশাদের সব মামলা থেকে দ্রুত জামিন পাওয়ার মতো ঘটনার জন্য তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলবেন, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। তো শেষ বছরটায় শেখ হাসিনা বিচার বিভাগ সম্পর্কে আর কী বলবেন? বিচার বিভাগের লোকজন সম্ভবত আখতারুজ্জামান বাবু কিংবা এরশাদের মামলাগুলোর মতো সরকারকে ঘিরে সব ধরনের মামলায় একই নজির সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তারা হয়তো আওয়ামী লীগের সব নেতা-কর্মীর মতো বিএনপির দু-একজন নেতা-কর্মীকে আইনের আওতায় জামিন দিয়ে দিচ্ছে। খুবই খারাপ কথা।

বিচার বিভাগের মানুষ, শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের শেষ বছরে আপনারা নিশ্চয় আরো বেশি লাঠিমিছিলের মুখোমুখি হতে চান না? যদি তাই হয়, তবে সে অনুসারে ব্যবস্থা নিন, যেন এরপর থেকে প্রধানমন্ত্রী তৃপ্তির সাথে বলতে পারেন, 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে।'

আসলে যে যাই বলুক, যে যাই লিখুক, প্রধানমন্ত্রী তার নিজস্ব গতিতেই চলবেন।

ডিগ্রি

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী বলেছিলেন, দেশ চালানোর ব্যস্ততার কারণে প্রধানমন্ত্রী আরো বেশি ডিগ্রি পাচ্ছেন না। না হলে তিনি প্রতিদিন একটি করে ডিগ্রি পেতেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই টার্মের ক্ষমতার বাকি দিনগুলোতে ডিগ্রিবিষয়ক এক মহা সিদ্ধান্তে তাকে উপনীত হতে হবে। তিনি দেশ চালানোর মতো কাজে ব্যস্ত থাকবেন কি থাকবেন না। যদি থাকেন তবে বাকি দিনগুলোতে তিনি ডিগ্রি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন। আর ব্যস্ত না থাকলে তার প্রতিদিনকার একটি ডিগ্রি সংরক্ষণের জন্য বাড়তি একটি মন্ত্রণালয় খুলতে হতে পারে।

বই

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বই হচ্ছে ঘুমের ওষুধ। আমার যখন ঘুম আসে না, তখন দু-একবার চোখ বুলোলে ঘুম এসে যায়।'

ক্ষমতার বাকি দিনগুলোতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা, শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখা, নিয়মিত স্বপ্ন দেখার জন্য ঘুম একটি অতীব জরুরি ব্যাপার। আশা করি এ কারণে প্রধানমন্ত্রী আরো বেশি 'বইনির্ভর' হয়ে পড়বেন। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের জন্য এ এক মহা

আনন্দের সংবাদ। দেশীয় প্রকাশনা সংস্থাগুলো যদি এতো বই নিয়মিত প্রকাশ ও সরবরাহ করতে না পারে, তাহলে 'আনন্দবাজারের' মতো আরো অনেক প্রকাশনা সংস্থাকে এ দেশে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পুরান ঢাকার বাংলাবাজার, কলকাতার আনন্দবাজারের মতো আরো অনেক 'বাজার কোম্পানি' বাজার মাত করতে নেমে পড়তে পারে।

বিদেশ সফর

গত বছরের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'দেশবাসীকে এই অবস্থায় রেখে দেশ ছেড়ে যেতে আমার খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী এ পর্যন্ত দুশ্চিন্তা ও কষ্ট নিয়ে বেশ কয়েকবার অনেক দিনের জন্য, দেশের বাইরে ছিলেন, যাকে বলা হয় বিদেশ সফর।

বাকি দিনগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরজনিত দুশ্চিন্তা ও কষ্টের পরিমাণ আরো বাড়তে পারে।

নিবেদিত পঙ্‌ক্তিমালা

প্রধানমন্ত্রী ভাগ্যবান। তার জন্য যেসব পঙ্‌ক্তি নিবেদিত হয়েছে, আর কারো জন্য তা হয়নি। কক্সবাজারের এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন এরশাদকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল, যদি বঙ্গোপসাগরের সব জল কালি হয়, আর সুন্দরবনের সব গাছ কলম হয়, তবুও এরশাদের গুণাবলি লিখে শেষ করা যাবে না (প্রিয় পাঠক, উপমাটা মেরে দেওয়া হয়েছে। তাই সমস্বরে ওই চামচার উদ্দেশ্যে বলুন নাউজুবিল্লাহ)।

ধারণা করা হয়েছিল, তেল গ্রহণ বা পঙ্‌ক্তি দ্বারা নিবেদিত হয়ে এরশাদই সকলকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন। কিন্তু সে ধারণা ভুল। শেখ হাসিনা সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন। স্বয়ং বাণিজ্যমন্ত্রী আব্দুল জলিল তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন, ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারের পর অদূর ভবিষ্যতে শেখ হাসিনা নোবেল শান্তি পুরস্কারেও ভূষিত হবেন বলে আশা করি। স্থানীয় সরকার-মন্ত্রী মহামতি জিল্লুর রহমান বলেছেন, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য শেখ হাসিনার যে অবদান তাতে তার নাম মাদার তেরেসা, সক্রেটিস, আব্রাহাম লিংকন ও মহাত্মা গান্ধীর পাশে খোদাই করে রাখা উচিত। ক্ষমতার বাকি দিনগুলোতে শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে আর কী মহান মহান পঙ্‌ক্তি নিবেদিত হতে পারে? প্রিয় পাঠক, কল্পনা করা যাক :

এক. শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য শেখ হাসিনার যে অবদান তাতে তিনি তার মরহুম পিতাকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

দুই. পদ্মা নদীর সব পানি (!) যদি কালি হয় আর পার্বত্য চট্টগ্রামের সব গাছ যদি কলম হয়, তবুও শেখ হাসিনার পানি ও শান্তিচুক্তির মহান অবদানের কথা দেশের সমস্ত দেয়ালে দেয়ালে লিখে শেষ করা যাবে না।

তিন. শেখ হাসিনা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নারী।

চার. বাংলাদেশ ও শেখ হাসিনা সমার্থক।

পাঁচ. যতদিন এ দেশের মানচিত্র থাকবে ততদিন শেখ হাসিনার বিভিন্ন অবদান আকাশের শুকতারার মতো জ্বল জ্বল করবে। এমন শুকতারা বছরে একটিই উদয় হয়।

প্রবচনগুচ্ছ

শেখ হাসিনার কিছু কথা প্রবচনে পরিণত হয়েছে। অতীতকাল হলে বলা যেত খনার (হাসিনার?) বচনে পরিণত হয়েছে। এমন দু-একটা প্রকৃষ্ট প্রবচনের উদাহরণ—

এক. বিএনপি সংসদ নির্বাচনে দশটি আসনও পাবে না। ('৮৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে)

দুই. নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। ('৯১ সালের নির্বাচনের পর)

তিন. আমি নিজে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হয়ে বিখ্যাত একজনকে '৮১ সালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করেছিলাম। তিনি ঠিকমতো বাংলা বলতে পারতেন না। কীটনাশককে বলতেন কীর্তিনাশক। আমি ঠিক করে দিতাম। তিনি এখন লম্বা লম্বা কথা বলেন। (ড. কামাল হোসেন সম্পর্কে)

চার. টেলিভিশন ও রেডিও থেরাপি দিয়ে বিরোধী দলকে শিক্ষা দেব। (রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে)

পাঁচ. নিজেদের বাংলাদেশের মানুষ মনে করেন না আপনারা। এক পা রাখেন ভারতে আর এক পা বাংলাদেশে। দুই নৌকায় পা রাখবেন না। বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করুন। (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে)

ছয়. প্রয়োজনে একটার বদলে দশটা লাশ পড়বে। (চট্টগ্রামে ২০০০ সালের জুলাই মাসে আটজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হওয়ার পর)

এমন প্রকৃষ্ট প্রবচনের উদাহরণ আরো অনেক দেওয়া যেত। বেচারা হুমায়ুন আজাদ আর মাহবুব কামাল প্রবচন লিখে যা এক-আধটু নাম করেছিলেন, তাদের কীর্তি ম্লান হয়ে যেতে পারে। সুতরাং শেখ হাসিনার প্রবচনগুচ্ছকে আর সংখ্যায় বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আগামী এক বছরে এই প্রবচনগুচ্ছ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকবে।

পিন মন্তব্য

আলপিন কারা কারা পড়েন, সেটা জানার জন্য একটি জরিপ চালানো হয়েছিল। দেখা গেল, এক নম্বরে রয়েছেন স্বয়ং খালেদা জিয়া। ড. ওয়াজেদ আলী মিঞা, কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমও আলপিন পড়েন। এমনকি লেখক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীও আলপিনের একনিষ্ঠ পাঠক। সুতরাং শেখ হাসিনাকে ঘিরে তারা যে মন্তব্যগুলো করেছেন সেগুলোকে 'পিন মন্তব্য' বলা যেতে পারে। আসুন পিন মন্তব্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

০ প্রয়োজনের সময় ভারত যন্ত্রাংশ সরবরাহ না করলে মিগ-২৯ শো-পিসে পরিণত হবে। তখন ওই বিমানে প্রধানমন্ত্রীকে টুঙ্গিপাড়া নিয়ে যেতে হবে!—খালেদা জিয়া

০ যে প্রধানমন্ত্রী ৩ ঘণ্টা ধরে চুল বাঁধে তার দ্বারা দেশের কী হতে পারে? ৩০টি বছর এক সঙ্গে থাকলাম কেউ কাউকে বুঝতে-চিনতে পারলাম না!—ড. ওয়াজেদ আলী মিয়া

০ শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা না হলে প্রধানমন্ত্রী না হয়ে গৃহিণী হিসেবে আজও ড. ওয়াজেদের ভাত রান্না করতেন! —কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম

০ প্রধানমন্ত্রী যে হারে ডক্টরেট কুড়াতে চেষ্টা করছেন (সম্ভবত স্বামী ড. ওয়াজেদকেও একহাত দেখানোর জন্য), তাতে নিজেই একদিন পস্তাবেন!—লেখক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী

আগামী বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে শেখ হাসিনাকে ঘিরে আরো ক্ষুরধার 'পিন মন্তব্য'—হবে ইনশাল্লাহ।

স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভাঙার দিন

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তার চোখে সুদূর ভবিষ্যতের হাতছানিময় নির্জনতা ছিল। তার বুকে দেশকে গড়ার তীব্র এক আকুতি ছিল। সেই আকুতি নিয়েই তাকে না ফেরার দেশে চলে যেতে হয়েছিল। কারণ মীরজাফররা তাকে হত্যা করেছিল। ধরে নেওয়া যাক, এই রাজার নাম অ্যাগামেমনন। এক রাজকবি তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন যার প্রথম চরণ এমন, 'নিহত জনক অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ!'

একদিন অ্যাগামেমননের দুহিতা ইলেকট্রা রাজ্যের ক্ষমতায় এলেন। তিনি একজন ন্যায়বিচারককে দেশের প্রধানতম কাজি বানালেন। মীরজাফরদের ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তারা গান গাইতে থাকল 'মা, আমি বন্দি কারাগারে। আছি গো মা বিপদে...।'

ইলেকট্রার স্বপ্ন দেখার বাতিক ছিল। একদিন শেষ রাতে স্বপ্ন দেখার পর তার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জেগে উঠলেন। ভাবলেন শেষ রাতে দেখা কোনো স্বপ্নই তার বিফলে যায়নি। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, মীরজাফরদের ফাঁসি কেন যেন হচ্ছে না! সারা দেশে সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধানতম কাজি প্রচলিত আইনের বাইরে এক পাও যাবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন! তিনি ভাবতে শুরু করলেন, কী করা যায়? প্রধানতম কাজিকে বরখাস্ত করা যায়? রাজ্য শাসনে 'ঢোল-শহরত-বাণী' প্রচার করে যারা তাদের স্বায়ত্তশাসন বা মুক্ত করে দেওয়া যায়? যদি রাজ্যের রানী থাকা অবস্থায় সেনাপতিরা অঘটন ঘটিয়ে ফেলে? কী করা যায়? তিনি প্রার্থনা করতে বসলেন। তিনি নিজেও জানেন না, তার ভবিষ্যৎ দিনগুলো কীভাবে কাটবে। তার কান্না পেল। আর মনে হলো, এক রাজকবির বিখ্যাত কবিতার কিছু চরণ—

জানি না বিধাতা পাষাণ কেন
চারিদিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙরে বাঁধন, ভাঙরে আগল...

এটি নিছক রূপকথার গল্প। শিশু, পাগল কিংবা বিকারগ্রস্ত মানুষ ছাড়া রূপকথার গল্পকে কেউ বিশ্বাস করে না।

দেবদূতের কবলে দুই নেত্রী

দেবরাজ চমকে গেলেন খুব। বাংলাদেশের দুজন মানুষকে তার 'না ফেরার দেশে' নিয়ে আসার জন্য তিনি এখনো কোনো দেবদূতকে পাঠাননি। অর্থাৎ তারা দুজন দিব্যি বেঁচে আছেন। তবু তাদের নিয়ে আগাম শোকবাণী বেরিয়েছে।

প্রথম শোকবাণীটি এমন :

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা না-ফেরার দেশে চলিয়া গিয়াছেন। চলিয়া যাওয়ার আগে তিনি স্বামী, এক কন্যা, এক পুত্র, এক দল কিন্তু অসংখ্য ডক্টরেট ডিগ্রি রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় শোকবাণী :

একদা প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া না-ফেরার দেশে চলিয়া গিয়াছেন। চলিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি অসংখ্য হরতাল ও অগণিত ইস্যু সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেও তার দুই পুত্রও ভঙ্গুর দলটিকে জননিরাপত্তা আইনের অধীনে এতিম অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন।

বিধাতা তখন দেবদূতকে ডেকে পাঠালেন। দেবদূত আসার পর বিধাতা তার কাছে জানতে চাইলেন বাংলাদেশের গত চার বছরের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

দেবদূত জানালেন, বাংলাদেশ সরকারের নথি মোতাবেক এ সরকার দুটি সফল চুক্তি (পানি ও শান্তিচুক্তি) করেছে, অর্থাৎ এ সরকার চুক্তিবাজ। দ্বিতীয়ত, সরকার একের পর এক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে যাচ্ছে, অর্থাৎ তারা স্বপ্নবাজ। তৃতীয়ত, এ সরকার তাবৎ জনগণের নিরাপত্তার জন্য মিনি মার্শাল ল' ধরনের একটি আইন পাস করেছে, অর্থাৎ এ সরকার আইনবাজও। বিধাতা দেবদূতকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এবারে বিরোধী দল সম্পর্কে 'তিন বাজ' বলুন।

দেবদূত আবার বলতে শুরু" করলেন, বিরোধী দলের নথি মোতাবেক তারা এ পর্যন্ত দুটি সফল লংমার্চ করেছে অর্থাৎ তারা মার্চবাজ। দ্বিতীয়ত, তারা ক্রমাগত হরতাল করে যা"ছে অর্থাৎ তারা হরতালবাজ। তৃতীয়ত, অসংখ্য ইস্যু মিস করার পর তাদের হরতাল-মিছিলে খুব কমসংখ্যক লোক উপস্থিত থাকতে দেখা গেলেও পত্রিকাজুড়ে তারা বিবৃতি দিচ্ছে যে, দেশবাসী তাদের সঙ্গে আছে অর্থাৎ তারা বিবৃতিবাজও।

দেবরাজ তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, যান, যে দেশের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা ডাইল কেনা-বেচা ও সেবনের দৃশ্য দেখার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কিন্তু বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি মাটি খুঁড়ে সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার করার কথা বলেন, অথচ থানার ভেতরে গিয়ে আসামি পেটানোর ঘটনা ঘটায় কে যেন, সে দেশটা একবার স্বচক্ষে দেখে আসুন।

দেবদূত এলেন বাংলাদেশে, প্রথমেই গেলেন বিএনপি অফিসে। সেখানে তালা ঝোলানো। বোমা বিস্ফোরণে একজন মারা গেছে। পুলিশ বলছে বিএনপি অফিসেই বোমা বানানো হচ্ছিল । আর বিএনপি বলছে সরকারের চররাই এ কাজ করেছে। দেবদূতের হাসি পেল। তিনি ভাবলেন, দেবরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেই দেখতে হবে আসল ঘটনাটা কী?

যা হোক, রাস্তার একটি দৃশ্য দেখে দেবদূত অবাক হলেন! রাস্তা বেরিকেড দিয়ে দুপুরের গনগনে রোদে বিএনপি এমপিরা দুপুরের লাঞ্চ সারছেন। এ দেশে লোকজন রাস্তাতেই প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি সারে, রাস্তাতেই ঘুমায়, সুযোগ পেলে খোলা রাস্তাতেই কাউকে কাপড় খুলে দিগম্বর করে দেয়, আবার রাস্তাতে বসেই লাইন ধরে খায়। মিছিলে রাস্তার দখল নিয়ে স্লোগান দেয়, শেখ হাসিনা (অথবা খালেদা জিয়া) ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই!

দেবদূত বিএনপির জনসভার ভেতর ঢুকে গেলেন। একজন পাতি নেতা জোর গলায় বক্তৃতা ঝাড়ছেন 'ভাইসব, আপনারা ট্রাক-টেম্পো, বাস, মিশুকের গায়ে লেখা দেখবেন-এই যানটি অমুক ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ। ঠিক তেমনিভাবে শেখ হাসিনা সরকারের গায়ে লেখা আছে, 'এই সরকার ভারতের কাছে দায়বদ্ধ।' পাবলিক তালি দেওয়া শুরু করল।

দেবদূত মজা পেয়ে গেলেন। বিএনপির আরেক নেতা কথা বলা শুরু করলেন, 'যখন শেয়ার মার্কেট তুঙ্গে, সরকারের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট অর্থমন্ত্রী তখন বললেন-এটা দিয়ে প্রমাণ হয়, দেশের অর্থনীতির অবস্থা জিন্দাদার। আর যখন শেয়ার বাজার ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়, কোনোক্রমে টেনে তোলা যায় না, তখন প্রধানমন্ত্রী বলেন, শেয়ার বাজার আমি তেমন ভালো বুঝি না। দেশ চালানো তারা কেমন বোঝেন, ভাইসব আপনারাই ভালো বুঝতে পারবেন। আবারও পাবলিক হাততালি দেয়া শুরু করল।

পাবলিকের কাজ যেন শুধু হাততালি দেওয়া, দেবদূতের তাই মনে হলো। তালি শুনে গিয়ারে উঠে গেলেন সেই নেতা। নেতা আরো জোরে বলা শুরু করলেন, শান্তি চুক্তির নামে পাহাড়ি এলাকাকে নরক বানানো হয়েছে। ভারতের উপজাতিরা এখন বাংলাদেশে আসছে দলে দলে। পানিচুক্তির নামে পদ্মাকে মরুভূমি বানানো হয়েছে। মিথ্যা ষড়যন্ত্রের নামে চার নেতাকে গ্রেপ্তার করা এবং পরে ১ লাখ টাকা করে জরিমানাসহ মুক্তি দেওয়ার পরও সরকারের ঝাল মেটেনি। ষোল বার টাকার অবমূল্যায়ন করে দেশের আমদানি-রপ্তানি খাতকে ক্যান্সারের রোগী বানিয়ে দিয়েছে সরকার। আর এ ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকা ছাড়া সরকারের আর কোনো কাজ আছে?

জনসভা সামান্য ঝিমিয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে মঞ্চে এলেন এক নেত্রী । কে যেন বলে উঠল, দেখি লজেন্স আপায় কী কয়? চকলেট-লজেন্সের কথা শুনে কান খাড়া করলেন দেবদূত। 'জননিরাপত্তা আইন করেছে সরকার। কী হবে এই কালো আইন করে? বিএনপির নেতা-কর্মীদের জেলে ভরার এই ষড়যন্ত্র আইন করে কোনো লাভ

হবে না। বাঁধন লাঞ্ছনাকারী রাসেলের কি শাস্তি হবে? জয়নাল হাজারীর মতো লোক সংসদে দাঁড়িয়ে বাঁধনকে নিয়ে যে অশ্লীল কথা বলে এতে তার কি কোনো শাস্তি হবে? কাদের সিদ্দিকীর জনসভা পণ্ডকারীদের কি কোনো শাস্তি হয়েছে? পুলিশ সীমারানীদের ধর্ষণ করে মেরে ফেলে। তানিয়াদের মতো শিশু বাচ্চাকেও রেহাই দেয় না। মনি বেগমদের শাড়ি খুলে নেয়। রুবেল, সুমন, জালালদের মারে বুক ফুলিয়ে। পুলিশের বুলেট লেগে রক্ত বেরুলে বলে গরু-ছাগলের রক্ত লাগানো হয়েছে। ছাত্রনেতা সোহেল ও পিন্টুকে অমানবিক ভাবে রাস্তা দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যায়। ভাইসব, জননিরাপত্তা আইন দিয়েও তারা শেষ রক্ষা করতে পারবে না। ইতিহাস তাদের টেনে নামাবে, পালাবার সময়ও পাবে না।

দেবদূত একটু ভিরমি খান। ভাবেন এখানে আর এক মুহূর্ত নয় । তার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তিনি রেস্টে চলে যান। পরদিন যান পল্টন ময়দানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবর্ধনায়।

আতিপাতি নেতাদের বক্তৃতা শুনে ভালো লাগতে শুরু করে যমদূতের। প্রধানমন্ত্রীকে একজন নোবেল পাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে দিলেন। বুড়োমতো একজন তাকে ম্যান্ডেলা, গান্ধী, ইয়াসির আরাফাতের সমকক্ষ বানিয়ে ছাড়লেন। একজন সব্যসাচী লেখক উপাধি দিয়ে ফেললেন ভাষাকন্যা। দেবদূত বুঝতে পারলেন না, বাহান্ন সালে প্রধানমন্ত্রীর বয়স কত ছিল?

আলহাজ উপাধির একজন নেতা দাঁড়ালেন বক্তৃতা মঞ্চে। বলা শুরু করলেন, 'জননিরাপত্তা আইন কেন মেনে নেয় না বিএনপি, নিজেদের পার্টি অফিসে বোমা বানানো দেখে তা আপনারা বুঝতে পারেন। শুধু হরতাল ডাকে, মানুষ তা মানে না। দেশ ধ্বংসের এই কর্মসূচি কেউই মানতে পারে না। ওদের আন্দোলনের সঙ্গে জনগণ নেই। আমরা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিক দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম। বিএনপি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। আপনারা জেনে রাখুন আওয়ামী লীগ আর বিএনপি এক নয়। ক্যান্টনমেন্ট আমাদের শক্তির উৎস নয়, আমাদের শক্তির উৎস জনগণ।'

দেবদূত বেরিয়ে এলেন হাসিনার সংবর্ধনা সভা থেকে। ভাবলেন, এই একই ক্যাসেট প্রতিটি জনসভায় গত ১০ বছর ধরে একইভাবে বাজানো হচ্ছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সরাসরি দুই নেত্রীর সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?

শেখ হাসিনা চমকে গেলেন! তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেবদূত। দেবদূত বললেন, ভয় পাবেন না। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। শেখ হাসিনা সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটাও সম্ভবত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল।'

শেখ হাসিনা বলা শুরু করলেন, 'দেশে দুটি কার্যকর চুক্তি হয়েছে। মানুষ শান্তিতে আছে। দেশে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে। মাতৃভাষা দিবসকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে আন্তর্জাতিক বানিয়ে ছেড়েছি। দেশ থেকে নিরক্ষরতা পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এ পরিস্থিতিতে যারা দেশে হরতাল ভাঙচুরের মাধ্যমে শান্তি বিঘ্নিত করতে চায়, জনগণ তাদের দাঁতভাঙা জবাব দেবে।

আর আপনি কষ্ট করে এদেশে এসেছেন, তাই আপনাকে বাংলাদেশ থেকে একটা সম্মানসূচক ডিগ্রি দান করতে চাই।'

দেবদূত মুহূর্তেই হাওয়া হয়ে গেলেন। তার মনে হলো গত চার বছরে শেখ হাসিনা এই কথাগুলো কমপক্ষে ৫০০ বার বলেছেন। তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ির দিকে রওয়ানা করলেন।

খালেদা জিয়া তাকে দেখে চমকে গেলেন! দেবদূত জানালেন, আজ তিনি অল্প কিছু কথা শুনে চলে যাবেন।

জাতীয়তাবাদী শুভেচ্ছা জানিয়ে খালেদা জিয়া বলতে শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কোনো কথা বলার রুচি আমার নেই। উহ্! কী জঘন্য। উনি আমার সম্পর্কে যেভাবে কথা বলেন, একই রকম কথা বাঁধন সম্পর্কে বলেন উনাদের সাংসদ জয়নাল হাজারী। উনিও হরতাল ডাকতেন। গোলাম আযম, এরশাদদের নিয়ে আন্দোলন করেছেন। আর এখন আমি করছি বলেই দোষ। ইয়াসমীন হত্যা নিয়ে নারীবাদীরা কি লংকাকাণ্ডই না করেছিল। অথচ সীমারানী, তানিয়া, বাঁধনদের এমন পরিণতির পরও বুদ্ধিজীবী, নারীবাদী আর এক শ্রেণীর পত্রপত্রিকা নিশ্চুপই থেকে যাচ্ছে। তার সরকার পাস করেছে সংবিধান ও মানবতাবিরোধী জননিরাপত্তা আইন। মানুষ ফুঁসে উঠছে অত্যাচারে। ক্ষমতাসীনরা ভারতে পালিয়েও কূল পাবে না। আপনি এসেছেন তাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাবধানে পথ চলবেন। নইলে রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান মিনুর মতো আপনাকেও জননিরাপত্তা আইনে ফাঁসিয়ে দিতে পারে।

দেবদূত চলে এলেন। তার ভালো লাগছে না কিছুই। তার মনে হচ্ছে বিএনপি অফিসে বোমার আঘাতে নিহত যুবকের কথা। হরতালের সময় নিহত পুরান ঢাকার কাঁচামাল ব্যবসায়ীর কথা। তার মনে হচ্ছে রুবেলের পরিবারের কথা। তার মনে পড়ছে সম্ভ্রম হারানো বাঁধনের সংসার ভাঙার কথা। আর এই মন খারাপই তাকে চরম উত্তেজিত করে তুলল। তিনি বিধাতার মুখোমুখি হলেন।

দেবরাজ অর্থাৎ বিধাতা জানতে চাইলেন, কেমন দেখলেন বাংলাদেশ? দেবদূত জানালেন, পরিস্থিতি নরকের চেয়েও খারাপ। ও দেশ থেকে কাউকে নরকে আনলে সে নরকে শান্তিতেই থাকবে। এর প্রতিবিধান করা দরকার। ঘাড় মটকে কঠিন শাস্তি দিয়ে না-ফেরার দেশে নিয়ে আসা দরকার বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের...।'

দেবরাজ দেবদূতকে শান্ত করলেন। বললেন, 'অথচ ওই দুই নেত্রী মিলেমিশে দেশ গড়ার কাজে নামলে দেশটা স্বর্গের মতো হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। দেবদূত আপনি অপেক্ষা করুন, দেখবেন নব্বই সালের মতো দেশ গড়ার কাজেও এ দুই নেত্রী এক হবেন, পাশাপাশি বসে ছবি তুলবেন, হাসবেন অতপর একসঙ্গে কাজ শুরু করবেন।'

দেবদূত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি জেনে এসেছেন, এটা বাংলার জনগণের অলীক কল্পনা অথবা স্বপ্ন। বাস্তবে এমন হতে পারে, এ আশা তারা ছেড়েই দিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবদূত ভাবতে লাগলেন, 'দুই নেত্রীর এমন ঐক্য কি তিনি অথবা দেবরাজ জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবেন?

সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন
সমগ্র পৃথিবী ক্লিনটন

গাবতলী থেকে শুরু করে সাভার-ধামরাই কিংবা ধামরাই থেকে জয়পুরা দুপাশের টং বা ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলো তুলে ফেলা হয়েছিল ক্লিনটন আসবেন, তাই বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছিল রাস্তার পাশের আটটি দোকান। বস্তি ভাঙা হয়েছে। দুঃখ পেয়েছেন অনেকেই। কিন্তু এই উচ্ছেদকৃত মানুষগুলো নাকি দুঃখও পাননি! নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল জয়পুরার নিঃস্ব কৃষক শমসেরের গমক্ষেত। তবু নাকি তারা অপেক্ষায় ছিলেন ক্লিনটনকে এক নজর দেখার। ক্লিনটনকে আপ্যায়ন করতে হবে তাই সামর্থ্যের সবটুকু আয়োজন দিয়ে জয়পুরার সীমা রাঁধলেন মুরগির ঝোল আর মমতা বেগম তৈরি করলেন ৪০টি কই মাছের অনন্য স্বাদের এক খাবার। ক্লিনটন তাদের গ্রামে এলেন না। সীমা আর মমতা বেগমের খাবার পরে কে কে খেয়েছেন আমরা জানতে পারিনি। নিঃস্ব কৃষক শমসের কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন কিনা তাও আগাম বলা সম্ভব না। শুধু যা বলে দেওয়া যায় সেটি হচ্ছে নবজাতকের নামকরণ। ক্লিনটন জয়পুরা যাবেন, তাই সন্তানসম্ভবা যে গৃহবধূর ছেলের নাম রাখার কথা ছিল কিনটন, তার নাম এখন রাখা হয়েছে 'দুঃখু মিঞা'। এ দেশে জাতীয় কবির ডাক নাম দুঃখু মিঞা। স্বপ্নভাঙা নবজাতকের নাম দুঃখু মিঞা আর সারা দেশকে সারাদিন অবরুদ্ধ রেখে জয়পুরা আর স্মৃতিসৌধ না গিয়ে বাংলাদেশের জন্য চিরস্থায়ী দুঃখের কারণ হয়ে থাকবেন হয়তো আমেরিকা এবং তার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন। আর সবাইকে ঠাণ্ডা করার জন্য দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর ক্লিনটনরা যা করবেন, সেটা নিতান্তই দুঃখপ্রকাশ!

হুজুর কিনটন

তবু শমসের, সীমা আর মমতা বেগমরা যে যার মতো ২০ মার্চ সকাল থেকে বসে যান টিভির সামনে। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকেন টেলিভিশন পর্দার দিকে। ছোট্ট শিশুটি যখন শমসেরের কাছে জানতে চায়, 'বাবা, ক্লিনটন সাহেব কেডা'? তখন শমসের দুঃখ নিয়ে বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, তয় সারা বিশ্বেরও প্রেসিডেন্ট। অঘোষিত রাজা। তবে শমসের লেখাপড়া জানেন না। ছড়া-কবিতাও পড়েননি। পড়লে বুঝতে পারতেন, সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন আর সমগ্র পৃথিবী

ক্লিনটন। পত্রপত্রিকা পড়লে শমসের জানতেন এবং নিশ্চয়ই তার ছেলেকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এ কথাটা বলতেন যে, 'বাংলাদেশের মানুষ অতীতে ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের শোষণের স্বীকার হয়েছে। এখন তারা মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ক্লিনটন সাহেব হচ্ছেন সেই কোম্পানির বড় কর্তা।'

এরই মধ্যে ক্লিনটন সাহেব এলেন। বিমান থেকে নামলেন। সবাই আফসোস করতে লাগলেন টিভি পর্দায় ক্লিনটনের ফুলপ্যান্ট দেখে। অ্যাশ কালারের স্যুটের প্যান্টটা বেশ খাটো। কেন? শমসেরের জানা নেই যে, এক বন্যা ছাড়া বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জনসংখ্যার এই দেশটি অন্য কোনো কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। এ দিকটা সম্ভবত ক্লিনটনও গভীরভাবে ভেবেছেন। তাই খাটো প্যান্ট পড়ে এসেছিলেন যাতে বন্যা শুরু হয়ে গেলেও তার প্যান্টে পানি না লাগে।

কিন্তু জয়পুরার ধর্মপরায়ণ এক মাদ্রাসা শিক্ষক শমসেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, গিরার ওপর ফুলপ্যান্ট পরা সুন্নত। মুসলিম দেশে ক্লিনটন তাই সুন্নতি ড্রেস পরে এসেছিলেন।

লে. কর্নেল কুত্তা

লাইলি-মজনুর প্রেমকাহিনীর অনেক ছোট ঘটনাও মানুষ মনে রাখে। কথায় কথায় সেটা বলে। যেমন, মজনুর কাছে লাইলির বাসার কুত্তাটাও খুব দামি, সম্মানিত। ক্লিনটন সাহেবের সঙ্গে আসা কুকুরগুলোও নিশ্চয়ই আমাদের মতো মজনু দেশের বাসিন্দাদের কাছে বেশ সম্মানিত।

তবে শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা নাকি কুকুরদের প্রটোকল নিয়ে প্রথমে বিপাকেই পড়েছিলেন। এই ভেবে যে, লে. কর্নেল কিংবা ব্রিগেডিয়ার কুত্তাদের কি লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর কিংবা সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকরা স্যালুট করবেন?

পরে নাকি তারা এর সমাধান পেয়েছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্ঞানী কর্মকর্তাদের কেউ কেউ নাকি এমন জ্ঞান দিয়েছিলেন যে, সিপাহীদের অনেক সময় অনারারি ক্যাপ্টেন বা লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত করা হয়। সেক্ষেত্রে তারা হন সাধারণ সৈনিক বা সিপাহীদের চেয়ে সিনিয়র অর্থাৎ স্যালুটযোগ্য কিন্তু সেকেন্ড লেফটেন্যান্টদের চেয়ে জুনিয়র। সুতরাং সেনাবাহিনীর অফিসাররা ওই অনারারি লেফটেন্যান্ট বা ক্যাপ্টেন সিপাহীদের স্যালুট করেন না। তেমনি লে. কর্নেল বা ব্রিগেডিয়ার কুত্তারা কুকুরদের মধ্যে সিনিয়র অর্থাৎ স্যালুট পাওয়ার যোগ্য কিন্তু যেকোনো মানুষের চেয়ে জুনিয়র। অর্থাৎ মানুষেরা তাদের স্যালুট করবে না।

উঁহু, পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলেন।

ক্লিনটনের পায়ের নিচে

খালেদা জিয়া কম কথা বলেন, অনেকেই এটা বলে থাকেন। তার কম কথা বলা নাকি ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। সত্যি কি তাই? তাহলে বাংলাদেশে যত বোবা মানুষ আছেন তারা সবচেয়ে ব্যক্তিত্ববান মানুষ?

আর তিনি সম্ভবত কম কথা বলেন না। ক্লিনটনের ফ্রি টাইমে তার সঙ্গে পনেরো মিনিটের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল খালেদা জিয়ার। কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন পয়তাল্লিশ মিনিট সময়। এটা ভাবার অবশ্যই কোনো কারণ নেই যে, ক্লিনটনের কাছে তিনি দেশ-জাতি ও বর্তমান সরকার সম্পর্কে ভালো কোনো কথা বলবেন। কোনো অতিথির কাছে ঘরের ভেতরকার হানাহানি-মারামারির নালিশ করা কি ভদ্রতা? কিংবা ক্লিনটনের কাছে বর্তমান সরকার সম্পর্কে কটূক্তি করা কি কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পর্যায়ে পড়ে?

তবু আমরা গর্বিত, কারণ খালেদা জিয়া অন্তত এটুকু বলেননি যে, মহামতি ক্লিনটন আপনার সঙ্গে হোটেলে দেখা করার পর শেখ হাসিনা আবার বলে বসতে পারেন, 'তখনই বলেছিলাম কোনো ভদ্রঘরের বউ হোটেলে...।'

তবে খালেদা জিয়া ক্লিনটনের সঙ্গে ডিনার করতে বঙ্গভবনেও গিয়েছিলেন। সারা দেশের মানুষ পৃথিবীর অধিপতি ক্লিনটনের কল্যাণে দুই নেত্রী এক টেবিলে খাবার খেয়েছেন, আনন্দময় হাসিও বিতরণ করেছেন, মুগ্ধ নয়নে সেটা দেখতে পেরেছে।

সম্ভবত এ কারণেই গত ১১ মার্চ বাম দলগুলোর এক জনসভায় বাসদের আহ্বায়ক আ ফ ম মাহবুবুল হক বলেছিলেন, 'কোরবানির মাংসের জন্য যেমন দরিদ্র মানুষ হুমড়ি খাইয়া পড়ে, ঠিক তেমনি সাম্রাজ্যবাদ তথা ক্লিনটনের পায়ের নিচে সরকার ও বিরোধী দল হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে!'

প্রশ্ন

প্রথমে ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরের সময় ২৫ মার্চ নির্ধারিত হয়েছিল। সরকার সেটা পরিবর্তন করে ২৬ মার্চ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমেরিকা রাজি হয়নি। কেন? ২৫ মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তান গণহত্যা চালিয়েছিল। আর স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানিদের গণহত্যার পক্ষে প্রত্যক্ষ মদদ যুগিয়েছিল আমেরিকা। সে কারণেই কি ক্লিনটনের সফরসূচি ২০ মার্চ এগিয়ে এনেছিল যুক্তরাষ্ট্র? একই কারণে কি ক্লিনটন পাকিস্তানে পদধূলি দিচ্ছেন ২৫ বা ২৬ মার্চ?

১৯৭৪-এ বাংলাদেশ সফরে এসে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোও প্রথমে স্মৃতিসৌধে যেতে চাননি। উদ্ভট ক্যাপ পরে গলফ খেলতে যেতে চেয়েছিলেন। পরে সেই পোশাকেই স্মৃতিসৌধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর ক্লিনটন হয়ে থাকলেন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বাংলাদেশ সফরে এসে স্মৃতিসৌধে যাননি।

স্মৃতিসৌধের অবস্থানটা কোথায়? আফগানিস্তান, কাশ্মীর, আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বা সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র কথিত পাকিস্তানে? নাকি একেবারে সাভার ক্যান্টনমেন্টের পেটের ভেতরে? পুরো একটা ক্যান্টনমেন্ট ক্লিনটনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ? সাভারের কোনো ধানক্ষেতে লুকিয়ে থাকা লাদেন বাহিনী মিসাইলের আঘাতে উড়িয়ে দিতে পারত ক্লিনটনের হেলিকপ্টার? তাহলে কী দরকার মিগ-২৯ কিনে? মহান সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী (?) চৌকস (!) সেনাবাহিনী পুষে?

সাংবাদিকরা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, '৭১-এর ভূমিকার জন্য ক্লিনটনের ক্ষমা চাওয়া উচিত কিনা? উত্তরে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, 'সময় এর জবাব দেবে! তবে আমরা কেন দাবি করব?' প্রিয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যদি ক্লিনটন চান তবে আপনারা কি জাতির পিতার হত্যাকারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি বা তার হত্যাকারীদের শাস্তির দাবি থেকেও সরে আসবেন?

নিতান্ত পাবলিকের ধারণা

এক. ক্লিনটনের নাকি পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল না। *নিউইয়র্ক টাইমস* লিখেছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী পাকিস্তানিরা এক ডিনার পার্টির আয়োজন করে সেখান থেকে হিলারির নির্বাচনী ফান্ডে ৫০ হাজার ডলার চাঁদা উঠিয়ে দেয়। অভিযোগ উঠেছে, এই চাঁদা পেয়ে হিলারি ক্লিনটনকে পাকিস্তানে যেতে প্রভাবিত করেছেন। যদিও হিলারি দৃঢ়ভাবে এটা নাকচ করে দিয়েছেন।

সুতরাং ক্লিনটনকে দিয়ে কেউ কোনো কাজ করিয়ে নিতে চান? তদ্বিরকারী দলের শীর্ষতম মানুষ হিলারি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছেন না? একবার মনিকার কাছে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন!

দুই. ক্লিনটন বাংলাদেশে আসার এক মাস আগে মার্কিনি অগ্রবর্তী দল বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন এলাকায় মানুষের শান্তি নষ্ট করা শুরু করে। সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর সবাইকে থোড়াই কেয়ার করতে শুরু করে। ইউরোপ-আমেরিকা মহাদেশের কোনো রাষ্ট্র নিদেনপক্ষে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমেরিকা এমন করতে পারতো? মাত্র ১২ ঘণ্টায় দেশ যেভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, ক্লিনটন এখানে পাঁচদিন থাকলে তো দেশে দুর্ভিক্ষ লেগে যেত!

তো সরকারপ্রধান আর সরকারের ভূমিকা এখানে কেমন ছিল? তাদের ভূমিকা দেখে কি মনে হয়েছে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ আছে? আমেরিকা কিংবা ক্লিনটনের সামনে কি আমাদের কোনো প্রাইভেসি থাকতে নেই?

একটি কৌতুক ছড়িয়ে পড়েছে সরকারপ্রধানকে নিয়ে। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল মেরুদণ্ডের ব্যথায় শেখ হাসিনা হাসপাতালে নীত হয়েছেন। সবাই খুশি হয়ে উঠল। তাহলে সরকারপ্রধানের মেরুদণ্ড আছে!

তিন. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডারদের নিরাপত্তা আছে? নিশ্চয়ই নেই। না হলে পুলিশ থাকলেও তারা কেন আলাদা অস্ত্র দিয়ে হল পাহারার ব্যবস্থা করে? ক্লিনটনের সফরের পর এখন কী মনে হচ্ছে? নিরাপত্তা নেই বলেই কি তিনি আলাদা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন? ছাত্ররাজনীতিতে পেশিতন্ত্রের ব্যবহারের অপকারিতায় ভীত হয়ে মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্যাডার বিল ক্লিনটনের ভাবসাব দেখার পর প্রেসিডেন্ট কি কোনো বিবৃতি দেবেন? মুহাম্মদ জাফর ইকবাল কি মনকাড়া কোনো কলাম লিখবেন?

চার. ক্লিনটনের কাছে খালেদা জিয়া জননিরাপত্তা আইন নিয়ে অভিযোগ করেছেন। ফেনীর ঘটনা বয়ান করেছেন। নিন্দুকেরা বলছে, ক্লিনটন মহামতি জয়নাল হাজারীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কেন?

ক্লিনটন নাকি *বাঁধনের বিচার চাই* বইটির এক কপি কিনতে চেয়েছিলেন। কারণ দেশে ফিরে তারও নাকি একটা বই লেখার ইচ্ছা আছে, যার নাম হবে *মনিকার বিচার চাই*

আমেরিকার প্রসিডেন্ট দেশে এসেছেন এটা দেখিয়ে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ কিছু ভুল করে। যেমন প্রেসিডেন্ট কার্টারের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত কার্টারকে মিসর সফরে আনিয়ে ইসরাইলের পক্ষে বড় ধরনের ছাড় দিয়ে দিয়েছিলেন, যা মিসরের স্বার্থহানির কারণ হয়েছিল। বিনিময়ে সাদাত কার্টারকে এই বলে রাজি করিয়েছিলেন যে, নির্বাচনে তিনি পুনঃনির্বাচিত হলে ইসরাইলকেও কিছু ছাড় দিতে রাজি করাবেন। উল্লেখ্য, কার্টার দ্বিতীয় দফা নির্বাচিত হতে পারেননি আর আনোয়ার সাদাত যা করেছিলেন, তার পরিণতি তিনি জীবনের বিনিময়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্লিনটনের পার্টি যে পরবর্তী নির্বাচনে জিতবে এর কোনো গ্যারান্টি আছে? এবং দুই বছর পর দেখা গেল তার পার্টি নির্বাচনে জেতেনি।

ক্লিনটন এ দেশে আসলেও তৈরি পোশাকের কোটা বাড়ানো, প্রবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকা নিশ্চিত করা, পিএল-৪৮০-র অধীনে নেওয়া ঋণ মওকুফের ব্যাপারে সরাসরি কোনো প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। আলোচনা হয়েছে কেবল, আর ক্লিনটনের সঙ্গে আসা অনেক সাংবাদিক ও ফ্রি প্রেসের কল্যাণে বাংলাদেশের যে প্রচার পাওয়ার কথা ছিল সেটাও হয়নি। সাংবাদিক আর প্রেস এয়ারপোর্ট, সোনারগাঁও হোটেল, ক্লিনটনের সফরের পরিবর্তে হাসিনা-খালেদার ঝগড়া আর আমাদের ঢাকা শহরের বস্তি নিয়েই মেতে ছিল। তারা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, এ দেশে বন্যা ও বস্তি আছে, সরকার বা বিরোধী দলের চেয়ে ভালো দুটো এনজিও ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংক আছে।

তারা ঠিকই করেছে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের কি মেরুদণ্ড আছে? থাকলে রাজনীতিবিদদের মধ্যে কেউ কি আছেন, যিনি ইরানের একদা প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের (যিনি নিহত হয়েছিলেন) মতো সগর্বে বলতে পারবেন, তেল ও গ্যাস আমাদের কাজেই লাগবে। নিজস্ব প্রযুক্তিতে না তুলতে পারলে সেটা মাটির নিচেই থাকবে, তবু মার্কিনিদের স্বার্থে গোপন কোনো চুক্তি হবে না!

আসলে আমেরিকা যার বন্ধু, তার শত্রুর প্রয়োজন হয় না। এ দেশে কোনো মেয়ে ধর্ষিতা হলে আমরা ধর্ষিতার পক্ষে দাঁড়াই আর ধর্ষণকারীর শাস্তি দাবি করি। ঋণের বোঝায় ডুবিয়ে ঋণ মওকুফ বা নতুন ঋণ দেওয়ার ছলে এই আমেরিকা যখন বিভিন্ন দেশের সম্ভ্রম খ্যাত অভ্যন্তরীণ সম্পদ লুটে নেয়, যখন বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা আর মর্যাদাকে ধর্ষণ করে তখন কীভাবে আমরা ক্লিনটনের পায়ের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি? মানুষের অনুভূতিকে আঘাত করে, চরম অপমান করে ক্লিনটন সাহেব বাংলাদেশীদের মন জয় করে গেলেন, এমন ভাবার সামান্য কোনো কারণও নেই।

সরকার নিরাপত্তা আইন

সেক্রেটারিয়েটের উল্টোদিকে মুক্তাঙ্গনে ১১ দলের প্রতীক অনশন হচ্ছিল।
জননিরাপত্তা আইন যেন পাস না হয় তার প্রতিবাদে এই প্রতীক অনশনের
আয়োজন করা হয়েছিল ৩০ জানুয়ারি। জিপিওর পেছনের পাবলিক টয়লেটের
সঙ্গে খোলা জায়গায়টায় ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছিল একটি ঘোড়াকে
ঢাকা শহরে হাতেগোনা যে কয়টি টমটম গাড়ি (ঘোড়ার গাড়ি) আছে তেমন একটি
গাড়ির ঘোড়া এটি। ঘাস খেতে খেতে ঘোড়াটি একসময় রাস্তায় এসে দাঁড়াল।
টোকাই শ্রেণীর কয়েকজন ঘোড়াটিকে দেখে ঘিরে দাঁড়ায়। রাস্তায় তখন অফিস-
ফেরত মানুষের ঘরে ফেরার তাড়া; যার ফলাফল যানজট। এর ভেতর ঘোড়াটা
রাস্তার কিছু অংশ জুড়ে আছে।
এ সময় একজন পুলিশের এসআই এসে ঘোড়াটার সামনে দাঁড়াল। চিৎকার করে
বলতে থাকল, ঘোড়ার মালিক কই? ঘোড়ার মালিক আবু মিঞা পুলিশ
সাবইন্সপেক্টর সামনে এসে দাঁড়াল।
সাবইন্সপেক্টর তাকে বললেন, এই যে ঘোড়ার বাপ, জানেন নাকি সংসদে
জননিরাপত্তা আইন পাস হয়েছে? যান চলাচলে প্রতিবন্ধককারীপর ধরলেই অন্তত
৭৫ দিনের মধ্যে জামিন নেই। কমপক্ষে দুই বছরের জেল! হাইকোর্টও জামিন
দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না!
আবু মিঞা ভয়ে শক্ত হয়ে যান। এটা আবার কোন ধরনের আইন? ফুটপাতে এসে
ব্যবসা করে হকাররা, শহরে ল বাড়ি পাওয়া যাবে যা রাস্তার ভেতরে এসে
পড়েছে। রাস্তায় মার্কেট হয়েছে। ট্রাফিক জাম বাধিয়ে রাস্তার মানুষের শান্তি

বিঘ্ন করে পথচারীদের ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করিয়ে ছুটে যায় প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি। হায়! এদের কারো তাহলে কমপক্ষে ৭৫ দিন জামিন নাই? ধরা পড়লেই দুই বছরের জেল!

পকেট থেকে কিছু বের করে দুই হাত জড়ো করে সাবাইন্সপেক্টরের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আবু মিঞা। একটু গাই-গুই করে তাকে ছেড়ে দেন দয়াবান সাবইন্সপেক্টর সাহেব। ঘোড়াকে নিয়ে ফুটপাতে তুলে রাখা টমটমটার সঙ্গে বাঁধার কাজ সারে আবু মিঞা। তখন তার মনে হয়, ট্রাফিক সপ্তাহে তো পুলিশরাই ঘোড়া নিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন যদি ঘোড়ার কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে তখন কি ওই পুলিশ বা ঘোড়াকে জেলে নেওয়া হবে?

আবু মিঞা ভাবে, পুলিশের জন্য সম্ভবত এই আইন না। পুলিশ ধর্ষণ করলে বা কাউকে মেরে ফেললেও তেমন শাস্তি হয় না। তাহলে কি আবু মিঞাদের কাছে থেকে পুলিশের টাকা নেওয়ার নতুন ধান্দার নাম জননিরাপত্তা আইন?

আবু মিঞা রাতের বেলা বাসায় বসে ভাবতে থাকে। জঘন্য এই আইনটির চিন্তা তার মাথা থেকে বের হতে চায় না। তার শৈশবের কথা মনে পড়ে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি। রংপুর দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ অবস্থা। এর ভেতরেই সে সময়ের আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির দোহাই দিয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু করেছিলেন। বলা হয়েছিল এই আইন সাময়িক। সেটা এখনও বহাল আছে। এই আইন চালু করেও সে সময়ের অন্তত দুজন আওয়ামী লীগ এমপির হত্যাকান্ড ঠেকানো যায়নি। তারা নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন। জননিরাপত্তা আইন করে কি শেখ হাসিনার ক্ষমতার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

আবু মিঞা বাসা থেকে বেরিয়ে পাশের রঙধনু ক্লাবে যায়। ক্লাবের দেয়ালে পত্রিকা টাঙানো থাকে। মানুষ ভিড় করে পড়ে। সন্ধ্যায় বা রাতে বিবিসি বা ভোয়ার খবর প্রচারের সময় রেডিওর সাউন্ড বাড়িয়ে দেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ, যেন সবাই শুনতে পায়। আবু মিঞা সিগ্রেট ফুঁকতে থাকা রঙধনু ক্লাবের ছেলেগুলোর দিকে তাকায়। যারা যখন সরকারে থাকে, এই ছেলেগুলো তদের দলের। তাদের কথোপকথন শোনে আবু মিঞা মনোযোগ দিয়ে।

প্রথম যুবক : আইন পাস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক হইছে। বুঝব এবার বিএনপি।

দ্বিতীয় যুবক : ঠিকই কইছস দোস্ত। আমাগো কী হইব? সিটি করপোরেশনে গোলাগুলি কইরা দেখাই দিছি না। কী হইছে? টেন্ডারবাজি করুম আমরা, জামিন না পাইয়া জেলেই থাকব বিএনপির পুলাপাইন।

প্রথম যুবক : ঠিকই আছে। বিএনপিও কম করে নাই। খুলনায় পহেলা ফব্রুয়ারি ৩ ঘন্টার ব্যবধানে দুজন ছাত্রলীগ মরছে। হত্যায় জড়িত সন্দেহে উত্তেজিত জনতা শাহজাহান নামে অন্য এক ছাত্রলীগ কর্মীকে পুলিশে সেপর্দ করলেও পুলিশ তারে ঠিকই ছাইড়া দিছে। সরকারে থাকলে কিছু সুবিধা তো পাওন যায়ই?

দ্বিতীয় যুবক:আরে সরকারে থাকলে মন্ত্রীর পুলা হইয়া থানার ভেতরে যাইয়া আসামি পিটান যায়। এমপি হইয়া গোলন্দাজ সাহেবের মতো যুবদল নেতাকে ঝুলাইয় পিটান যায়। কাউকে মাইরা ফালাইলেও সেটা আত্মহত্যা বইলা চালাইয়া দেওন যায়।

গাঁজায় দম দিতে থাকা মুখে হালকা দাড়ি আউলা চুলের এক যুবক কথোপকথনরত যুবকদ্বয়ের দিকে এগিয়ে আসে। বিজ্ঞের মতো বলে, দোস্তরা জানো তো, প্রচলিত বুদ্ধিজীবীরা, এখনও কেউ জননিরাপত্তা আইন নিয়ে সাধু-অসাধুদের সাবধান করে দেয়নি। কেউ এটাকে এখনও শহরের বক বক বলে স্বীকৃতি দেয়নি। কেউ কবিতাও লেখেনি। কেন দোস্ত জানো?

দুই যুবককে চুপ দেখে ওই গাঁজা সেবানরত যুবক বলে, দোস্ত তোমাগো একটা কৌতুক শোনাই। আচ্ছা বল তো, সজারুর উপর পুরো নগ্ন হয়ে বসা কি সম্ভব? যুবক নিজেই বলে তিনভাবে এটা সম্ভব হতে পারে। এক. পশ্চাৎদেশ যদি নিজের না হয়; দুই. সজারুর কাঁটা যদি বসার আগে ছেঁটে ফেলা যায় আর তিন. সজারুর ওপর নগ্ন অবস্থায় বসার নির্দেশটা যদি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেয়।

শব্দ করে হেসে ওঠে দুই যুবক। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকর পর ফিরে এসে আবু মিঞা নিজ ঘরে। রাতে তার ঠিক মতো ঘুম হয় না। শেষ রাতে একটু ঘুম আসলে দুঃস্বপ্ন দেখে তার ঘুমটা ভেঙে যায়। পরদিন রঙধনু ক্লাবে এসে আউলা চুলের দাড়িওয়ালা যুবককে সে খুঁজে বের করে। নিজের পরিচয় দিয়ে আবু মিঞা বলে, 'ভাই সাহেব বড় দুশ্চিন্তায় আছি। একটা কথা জিগাইতে চাই।

আউলা যুবক গাঁজা ধরায়। তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

আউলা যুবক বলে : কী জিগাইবেন?

আবু মিঞা : ভাই সাহেব স্বপ্নে হাতকড়া দেখছি। এর মানে কী?

আউলা যুবক : এর মানে দেশে জননিরাপত্তা আইন পাস হইছে।

আবু মিঞার কেমন যেন ঘোর লাগে। সে কিছু বুঝে উঠতে পারে না। আউলা যুবক তারে বলে, হাতকড়া কী জানেন? আবু মিঞা : জানি, পুলিশে ধইরা লওনের সময় হাতে পরায়।

আউলা যুবক বলে, স্বপ্নে যখন দেখেছেন, তখন হাতকড়া মানে বন্ধুত্বের বন্ধন।

যুবকের কথা আর গাঁজার গন্ধে আবু মিঞার মাথা আরো হালকা হয়ে যায়। তার মাথায় বন্ধুত্বের বন্ধন শব্দটা ঘুরতে থাকে। যুবকটি আরো বলে এরপর স্বপ্নে দেখবেন জেলখানা. এর মানে কি জানেন?

আবু মিঞার নিরুত্তর দেখে আউলা যুবকই বলে. জেল খানা হচ্ছে জননিরাপত্তা আইনে জামিন না পাওয়ার পর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাসহ নিরাপদে থাকার স্থান। আবু মিঞা কোনোক্রমে বলে. 'ভাই সাহেব কিছুই তো বুঝলাম না। আওয়ামী লীগ কি আমাদের বন্ধু না।'

আউলা যুবক বলে, আওয়ামী লীগ আপনার ভাই। কারণ, ভাই পাওয়া নির্ভর করে বাবার ওপর। আপন না সৎ ভাই সেটা আপনি বোঝেন। তবে আওয়ালী লীগ মনে হয় আপনার বন্ধু না। কারণ বন্ধু বেছে নেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে!

আবু মিঞার মাথাটা এবার পুরোপুরি আউলা হয়ে যায়। সে মাথা নিচু করে ফিরে আসে। টমটম গাড়ি নিয়ে সে আর রাস্তায় বের হয় না। একবার শুধু রঙধনু ক্লাবে যেয়ে পত্রিকা পড়ে আসে। দেয়ালে সাঁটানো রঙচঙা একটা পত্রিকায় লেখা হয়েছে :

'আগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে প্রতিমাসে কমপক্ষে ৩০০ জনকে অবৈধভাবে আটক করা হতো। নতুন জননিরাপত্তা আইনে এটা কি দ্বিগুণ হবে? অন্য জায়গায় লেখা আছে জননিরাপত্তা আইনের ৮, ১০, ১২, ১৫ ধারা সরাসরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিদেশী দলকে দমন করার জন্যই এটা ব্যবহৃত হতে পারে। ৮ ধারায় বলা আছে, চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাড়ি চালিয়ে নিলে ৩ থেকে ১৪ বছরের জেল। এর মানে কি বাসে উঠলেও ভয়ে থাকতে হবে?

১০ ধারায় বলা আছে, হরতাল যদি জনগণের বিঘ্ন ঘটায়, কেউ যদি দেশকে অচল করে দেওয়ার হুমকি সংবলিত বক্তৃতা দেয় তাহলেও সেটা জামিন অযোগ্য অপরাধ।

১২ ধারায় বলা আছে, যারা প্ররোচণা দেবে তাদের ও একই শাস্তি হবে।

১৫ ধারায় বলা আছে, যদি পল্টনে মিছিল করার ঘোষণা কেউ দেয় তাহলে পথচারীদের বিঘ্নের কথা চিন্তা করে ওই নেতাকে গ্রেপ্তার করা যাবে। আর যদি কারো দুই বছরের জেল হয় তবে তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না।

আবু মিঞা মনস্থির করে, তার গ্রামের এক বিখ্যাত লোক—যিনি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তার কাছে যাবে। আবু মিঞা তাই করে। অধ্যাপক সাহেব তাকে বলেন—

বুঝলা আবু মিঞা, এটা হচ্ছে হাসিনা সরকারের গদি ঠিক রাখার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা আইন। তোমার বউ যদি তোমার বিরুদ্ধে গায়ে হাত তোলার অভিযোগ আনে তবে তোমার ১০ বছরের জেল হতে পারে। তোমার শালী যদি তোমার বিরুদ্ধে অশোভন অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগ আনে তবে তা যৌন হয়রানি গণ্য করে এই আইন তোমাকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিতে পারে। আবু মিঞা বলে, অধ্যাপক সাহেব এগুলো বাদ দেন। শেখ হাসিনা তো বলেছেন, এই আইন সবার জন্য সমান ভাবে প্রয়োগ হবে। তো এই আইন নিয়ে এত ভয় কেন? অধ্যাপক সাহেব তাকে বলেন, 'মাত্র ১৮ মিনিটে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দরপত্রে হস্তক্ষেপ, গাড়ি ভাঙচুর, যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা, মুক্তিপণ দাবি, ত্রাস সৃষ্টি ও অপরাধে প্ররোচণার জন্য বিশেষ শাস্তি সংবলিত এই আইন পাস হয়েছে। অথচ এগুলো বিচারের জন্য উপযুক্ত আইন আগেই ছিল। এই আইন দিয়েও কিন্তু সরকার ব্যাংক দখলকারীকে গ্রেপ্তার করাবে না। কাদের সিদ্দিকীর জনসভা পণ্ডকারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের ধরবে না। এমনকি ২ ফেব্রুয়ারি হরতালে বিএনপি অফিসে বোমাবাজি নিয়ে সরকার সরব থাকলেও মাত্র একদিন আগে খুলনার দুই যুবলীগ কর্মীকে হত্যার সন্দেহে শাহজাহান নামের ছাত্রলীগ কর্মীকে ঠিকই ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।'

আবু মিঞা এবার যেন কিছু একটা বুঝে উঠতে পারে। সে ঘরে ফেরে। গোসল-বিশ্রাম সেরে টমটম গাড়িটা নিয়ে হরতাল শেষে রাস্তায় বের হয়। লোকজন তেমন কেউ রাস্তায় নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর দুজন যুবক-যুবতী আসে। তারা এক ঘণ্টা ঘোড়ার গাড়িতে ঘুরতে চায়। টাকা-পয়সার রফা হওয়ার পর তাদের নিয়ে ছুটতে শুরু করে আবু মিঞা।

যুবতীটি মনখারাপ করেছে সাময়িক। যুবকটি তাকে একটি কৌতুক বলতে শুরু করল। বিল ক্লিনটন এসেছেন বাংলাদেশে। তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে আমেরিকা যাওয়ার আগে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বললেন, আপনি খুব ভাগ্যবতী। এখানে আসার আগে জননিরাপত্তা আইন নিয়ে অনেক কিছু শুনেছিলাম। এসে দেখলাম বিটিভি আর বাংলা দৈনিকগুলো এ নিয়ে তেমন কিছু লেখেনি। আমার খুব আফসোস লাগল।

শেখ হাসিনা জানতে চাইলেন, কেন?

বিল ক্লিনটন বললেন, 'আপনার মতো এমন বিটিভি ও পত্রপত্রিকা আমার থাকলে আমার ও মনিকার প্রেমকাহিনী কেউ জানতেই পারত না।

যুবকটির কৌতুক শুনেও মেয়েটি হাসল না। ঘোড়ার গাড়ি চলছে। তারাও দুলছে। যুবতীটিকে চমকে দেওয়ার জন্য যুবকটি আবারও বলল 'জানো, ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আত্মহত্যা করেছে।'

যুবতী তাকে বলল, এত বড় ঘটনা ঘটলে আমি নিশ্চয়ই জানতাম। কারণ আমার বাবা আওয়ামী লীগের এমপি। যুবকটি তাকে বলল, প্রধানমন্ত্রী-কন্যা পুতুলের শাশুড়ি নাকি তার স্বামী মোশাররফ হোসেনের পিস্তল দিয়ে নিজ মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন। অথচ কেউ পিস্তলের গুলির শব্দ পায়নি। তিন ঘণ্টা পরে সবাই পুতুলের শাশুড়িকে মৃত অবস্থায় পেলেও পিস্তলটি ছিল একটি ড্রয়ারে।

ঠিক তেমনি সংসদে পিস্তল নামের কলমে ৩০ জানুয়ারি জঘন্য নর্দমার আইন পাস করে আওয়ামী লীগ আত্মহত্যা করলেও সেই শব্দ বা ঘটনা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝতে বুঝতে তিন ঘণ্টার জায়গায় তিন বছর বা তিন মাস কেটে যেতে পারে।

বিদায় ১৯৯৮
ধরে রাখা আর ধরা খাওয়ার বছর

কতো উৎসব, আয়োজন আর আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে মানুষ থার্টি ফার্স্ট নাইটের অপেক্ষায় থাকে। এই সবকিছু কি বছরকে বিদায় দেয়ার জন্য? নাকি নতুন বছরের আগমনের জন্য? বিদায় বেদনা আর আগমনী আনন্দের পরিমাণটা হয়তো সমান সমান। শিক্ষাবর্ষের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের মতো বাজেটসহ বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার আর ডায়েরিতে আসলে একটি বছরকে ধরে রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চলে। বছরটা চলেই যায়। ধরে রাখা যায় না। বছরের এই চলে যাওয়ার কাছে মানুষের এই ধরে রাখার চেষ্টাটা ধরা খায়। হায় সারাটা বছর যেন চলে এই ধরে রাখা আর ধরা খাওয়ার অদ্ভুত আয়োজন। প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র কাসে ঘুমুলে ধরা খায় কানে ধরার অসুখে আক্রান্ত শিক্ষকের হাতে। দৈনিক মানবজমিন জানাচ্ছে, বিদেশী ডেলিগেট বা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো কোনো মিটিংয়ে ঘুমিয়ে পড়েন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ। হায়, কানে ধরার ব্যামো আছে যে শিক্ষকের , তার পাল্লায় একবার যদি পড়ে যান পররাষ্ট্রমন্ত্রী! পুনর্বার বিয়ের গুজবের কাছেও ধরা খেয়েছিলেন তিনি। রসিকতা করে তিনি নাকি বলেছেন, করেছি নাকি? তবে মালটা কোথায়? অবশ্য পরে তিনি বিয়ে করেছেন।

সাতানব্বই-এর প্রধান দুটি আলোচিত চরিত্র ছিল 'শেয়ারে ধরা' ও 'ছেলে ধরা'। আটানব্বইতে এসেও শেয়ারের সূচককে ধরে রাখা যায়নি। তবে সাতানব্বইতে 'ছেলে ধরা'র বিপরীতে 'মেয়ে ধরা' উপাধি পেয়েছিলেন আজিজ মোহাম্মদ ভাই। আটানব্বইতে তিনি পেয়েছেন 'নায়িকা ধরা'র খ্যাতি। উল্লেখ্য, এই নায়িকারা সব 'মেড ইন ইন্ডিয়া'।

৭৩ সংখ্যাটা একই সঙ্গে ধরা খাওয়া এবং না খাওয়ার প্রতীক। ৭৩ বিসিএস ব্যাচের অফিসাররা নাকি এই সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি প্রমোশন পেয়েছেন। এ বছর রাজনৈতিক ঘটনায় জড়িত থেকে নিহত হয়েছেন ৭৩ জন

মানুষ। ছবি মুক্তি পেয়েছে ৭৩টি। আর এ বছর ব্যাংকক এশিয়াডে ধরা খাওয়া বাংলাদেশ দলের সদস্য সংখ্যাও ছিল ৭৩ জন। শুধু হকি ম্যাচে তারা ৭৩ গোল খায়নি, এই রক্ষা!

পুলিশের হাতে ধরা খাওয়া নিয়ে এ বছর একটি জরিপ হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রী 'পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর কী হতে পারে' এমন প্রশ্নের ওপর জরিপ চালিয়ে জবাব পেয়েছে, সাধারণ ছেলেরা ধরা পড়লে তাদের অবস্থা অরুণ চক্রবর্তী, তুহিন, রুবেলের মতো হতে পারে। চিত্রনায়ক সোহেল চৌধুরীর মৃত্যুর পর পুলিশ প্রমাণ করেছে আদনান বা ড্রাইভার সেলিমদের ধরা তাদের পক্ষে অনেক সহজ কিন্তু বান্টি ইসলাম তাদের আশ্রয়ে আছে অথবা ট্রাম্পস নামে একটি বার ও ডান্স ফ্লোর আছে সেটা স্বীকার করা খুব কঠিন! তবে এসি আকরাম 'সেরা ভিলেন' হিসেবে ধরা খাওয়ার আগে তার 'পূর্বজীবনের কৃতিত্ব' মানুষকে ধরিয়ে দেয়ার পুলিশি প্রচেষ্টাও ছিল লক্ষণীয়।

চিড়িয়াখানায় বিষক্রিয়ায় বাঘের মৃত্যুর পর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ 'দর্শনার্থী সমস্যায়' ধরা খেয়েছিলেন। জানা গেছে, দর্শনার্থীর সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছিল। ইদানীং তারা দর্শনার্থীদের ধরে রাখতে পারছেন। তাদের সংখ্যা বাড়ছে। দর্শনার্থীরা কি আশা করছেন মানুষরূপী নতুন শূকর কিংবা সজারুকে চিড়িয়াখানায় আনা হতে পারে? প্রিয় পাঠক, *দৈনিক মানবজমিনে* তাদের অর্থাৎ আহমদ ছফা ও হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার ও বিতর্কযুদ্ধ যিনি পড়েছেন আশা করি তিনি ধরা খাবেন না। কাকে আনা যায়? শূকর হিসেবে আনতে হয় আহমদ ছফাকে, যদি হুমায়ুন আজাদের পরামর্শ মেনে নেয়া হয়। আর সজারু হিসেবে আনতে হয় হুমায়ুন আজাদকে, এ পরামর্শ আহমদ ছফার। একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে শুধু হুমায়ুন আজাদ কিংবা আহমদ ছফাই ধরা খাননি। এই তালিকায় রাজনীতিবিদদের নাম চলে আসবে সবার আগে। মসজিদে আজানের পরিবর্তে এখন থেকে উলুধ্বনি শোনা যাবে, এমন বক্তব্য দিয়ে ধরা খাওয়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। সরকার পতন আন্দোলনে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি ইস্যু হাতছাড়া করে তিনি 'ধরা খাওয়া' তালিকায় নাম সম্ভবত স্থায়ী করে ফেলছেন। নামকরণ আর স্বপ্ন ছিনতাই করে শেখ হাসিনাও ধরা খেয়েছেন। অবশ্য দেশবাসীর গ্যাস আর বিদ্যুৎহীনতায় ভোগার জন্য তিনি পুরোপুরি ধরা খাবেন কিনা সেটা খালেদা জিয়াও বলতে পারছেন না।

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ বছর কোচিং সেন্টারের সংখ্যাকে ধরে রাখা গেলেও বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নিহত সদস্যদের নামে কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারটিকে অল্প পরিসরে ধরে রাখা যায়নি। মানুষের মাথা ধরা, পায়ে ধরা, সম্ভ্রম ধরার ঘটনাকেও অল্প পরিসরে ধরে রাখা যায়নি। খালেক সাহেব চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। মহিলা এমপি ভারতী নন্দীর স্বামী এমপি হোস্টেলে নিজের সম্ভ্রম ধরে রাখতে পারেননি। ধর্ষণ কিংবা যৌন হয়রানির ঘটনাও বছর জুড়ে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধরে রাখা যায়নি। ধরে রাখা যায়নি সিনেমার গানের সংখ্যা, গোল খাওয়ার সংখ্যা, আর ক্রিকেট খেলায় পরাজয়ের সংখ্যাকে । (৭৩×৫=৩৬৫, গড়ে প্রতিদিন একটি গানের জন্ম হয়েছে।) তবে সব গানের ভেতর একটি গান আর সবগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে। সেটি হচ্ছে, পড়ে না চোখের পলক/কী তোমার রূপের ঝলক।

আজিজ ভাইয়ের সঙ্গে ইন্ডিয়ান নায়িকার হাসিমাখা ছবি পাবলিক পলকহীন দৃষ্টিতে ধরে রেখেছে। কুফা এয়ার পারাবাতের ট্রেনিং বিমান দুর্ঘটনাকে সবাই স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন। এক মন্ত্রণালয়ে ধরা খেয়ে অন্য মন্ত্রণালয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পেরেছেন মন্ত্রী নূরউদ্দিন খান। ক্রিকেট খেলোয়াড়রা গর্ডনের আসল ট্রেনিং ধরে রাখতে পারেননি। ট্রেনিং ছিনতাই-এর পর অন্যভাবে সেঞ্চুরি করে নিজেকে 'ধরে রাখা'র তালিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরনগরের জসীমউদ্দীন মানিক। বর্তমানে তিনি আমেরিকাপ্রবাসী। তার 'ট্রেনিং' তিনি পুলিশ, শিক্ষক, আমলা বা অন্য কারো কাছে জমা দিয়ে গেছেন কিনা সেটা খুঁজে বের করা দরকার। নইলে সরকারের ইমেজ ধরা খেতে পারে!

মনিকার জন্য শেষমেশ ধরা খেলেন ক্লিনটন, বেঁচে গেলেন বাপের বেটা সাদ্দাম। আমাদের চেতনা শহীদ মিনারের হাঙ্গামা থেকে ছাত্রদলকে ধরে রাখা যায়নি। এই হাঙ্গামায় ধরা খেয়েছিলেন রামেন্দু মজুমদার। দুবাই এয়ারপোর্টের একটি দোকানে চুরি করার ঘটনায় ধরা খেয়েছিলেন বিএনপির এমপি শহীদুল ইসলাম।

এমন ধরে রাখা আর ধরা খাওয়ার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে বছর জুড়ে'। স্মৃতিতে তার কতোটা ধরে রাখা যায়? তবে 'ষড়যন্ত্র' নিয়ে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি পরস্পরের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছে।

এমন 'ষড়যন্ত্রের' বিকৃত প্রচারণায় এখন আর দেশবাসীকে ধরে রাখা যাবে না বলে প্রমাণিত হয়েছে। ষড়যন্ত্রের কবলে ধরা না খেয়ে দেশবাসী এখন বিশ্বের কাছে 'গল্পের' বিষয়বস্তু হয়েছে। বছরের সেরা ধরা না খাওয়ার গল্প ছিল এটাই।

এশিয়াডে কাবাডি খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে রৌপ্য আর ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশ। বিদেশীরা অভিযোগ করলো, নিশ্চয়ই এটা বাংলাদেশের ষড়যন্ত্র। তারা নতুন একটি প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত করলো। এই প্রতিযোগিতার নাম 'দুধ দোয়ানো' প্রতিযোগিতা। তাদের ভাবখানা এমন ছিল যেন এবার দেখা যাবে বাংলাদেশীরা কেমন পারে, কিভাবে ষড়যন্ত্র আঁটে! ইংল্যান্ডের প্রতিযোগী বালতি নিয়ে গেলো। মাত্র ত্রিশ মিনিট সে এক বালতি দুধ দুয়ে ফেললো । ভারতের প্রতিযোগী এক বালতি দুধ দোওয়াতে সময় নিলো ২৫ মিনিট। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের প্রতিযোগী সময় নিলো ২০ও ১৫ মিনিট। এবার বাংলাদেশী প্রতিযোগীর পালা।

বালতি নিয়ে দুপুর দুটোয় সে দুধ দোয়াতে গেলো। ফিরলো মাগরিবের আজানের পরে। তারপর ফলাফল ঘোষণার মঞ্চে গিয়ে সে চিৎকার করে জানালো, ভাইসব আমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। আমার জয় নিশ্চিত দেখে ষড়যন্ত্রকারী আয়োজকরা আমাকে দুধওয়ালা গাভীর পরিবর্তে ধরিয়ে দিয়েছিল একটি পাগলা ষাঁড়কে। তবু দেখুন আমি ধরা খাইনি। বালতিতে আমি কিছু দুধ নিয়ে আসতে পেরেছি।

সবাই বালতির দুধ দেখে জানতে চাইলো ষাঁড়ের দুধ সে কিভাবে দোয়ালো? বাংলাদেশের প্রতিযোগী জানালো সেটা তার স্বপ্নে পাওয়া একটা মন্ত্রবলে সম্ভব হয়েছে। সেই স্বপ্নের প্রচার করে সে হাসিনা কিংবা খালেদার মতো ধরা খাক তা সে চায় না!

বিদায় ১৯৯৯

কষ্টে আছে আইজউদ্দীন, অপেক্ষায় নাজির

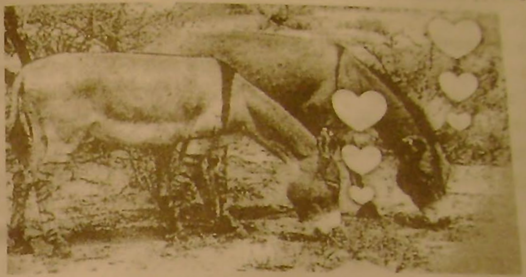

উপসর্গ দেখে নাকি স্বর্গ চেনা যায়। যেমন-খেলাপি উপসর্গের যিনি বাহক, ধরে নিতে হবে তিনি ধনের স্বর্গে বাস করে থাকেন। গালাগালি উপসর্গের যিনি উপমা, তিনি সাংসদ সেজে সংসদ ভবনে অধিবেশনের নামে গালাগাল করে থাকেন। তেমনি বাংলাদেশ নামের স্বর্গে বসবাসকারীদের উপসর্গগুলো বোঝা যায় দেয়াললিখন দেখে। সারা বছর কেমন ছিল বাংলাদেশীরা, যেন তাই লিখে রেখেছে দেয়ালে দেয়ালে নাজির ও আইজউদ্দীন। হয়তো ভালো কিছুর অপোয় থেকে নাজির লিখেছে অপোয় নাজির আর আপামর জনসাধারণের মতো সারাটা বছর কষ্টে থেকে আইজউদ্দীন লিখেছে-কষ্টে আছি।

স্মাগলার-চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করা হবে-এমন অপো নিয়ে বছর শুরু করেছিল নাজির। যেন মাটি খুঁড়ে গ্রেপ্তার করা হলো আজিজ মোঃ ভাইকে। অথচ গ্রেট ভাইকে নাজিরের মতো অপেক্ষায় থাকতে হয়নি। ডিবি অফিসেই তার দেখা হয়েছিল ডালিয়াসহ আরো তিন বান্ধবীর সঙ্গে। কপালে থাকলে কী না হয় ? লালবাগের লিটনদের মতো নাইন গুটারগান নিয়ে রাস্তায় নামলে হিরোই হয়!

জানুয়ারিতেই ঈদের চাঁদ দেখার অপোয় ছিল নাজির। অথচ কী হুলস্থুলই না হলো সারা দেশে। চাঁদ দেখার ঝগড়ায় কেউ কেউ তো ঈদের দিনটাই পাল্টে দিল। আর হরকাতুল জেহাদের সদস্যরা মারতে গেল বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানকে। কবি লিখেছিলেন, 'কবিকে দিও না দুঃখ তাহলে সে জলেস্থলে-অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে দেবে দুঃখের অক্ষর!

সেই দুঃখের অক্ষর দেয়ালে লিখতেই বুঝি রাস্তায় নেমেছিল কষ্টে থাকা আইজউদ্দীন। তার প্রিয়া হয়তো চলে গিয়েছিল। যেমন এরশাদকে উপেক্ষা করে জিনাতসহ আরো ১১ জন এমপি বছরের প্রথম সংসদ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল। দেয়াললিখন লিখতে রাতে আইজদ্দীন যখন রাস্তায় বের হতো তখন তার সঙ্গে থাকত এক ভাসমান নেড়ি কুকুর। এই কুকুরটিও কষ্টে ছিল। ডগ স্কোয়াড এনে তাকে নিজ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর কুকুর করে ফেলা হয়েছে। আর

এই ডগ স্কোয়াড তার প্রথম অপারেশানে এ বছরের এপ্রিলে মাত্র ১৬ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। স্পেশাল সুপ খেয়ে মাত্র ১৬ বোতল ডাইল। হয় কষ্ট, হয় লজ্জা! অপেক্ষায় ছিল এবং অপেক্ষায় আছে নাজির। জাতীয় পার্টি পুনরায় ক্ষমতায় আসে নাকি সেটা দেখার অপেক্ষায় ছিল সে। এ বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি এরশাদ ঘোষণা দিয়েছেন, জাতীয় পার্টি আবারও ক্ষমতায় এলে সিলেটকে প্রদেশ ঘোষণা করবে! কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাগল সম্মেলন দেখার অপেক্ষাচ্ছা (অপেক্ষা+ইচ্ছা) পূরণ হয়েছে নাজির। তবে রেডিও টিভির স্বায়ত্তশাসনের অপেক্ষায় থাকার মতো বোকা নয়। খোদ বিধাতাও নাকি বাংলাদেশের রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন দেখে যেতে পারবেন না।

তবে আইজউদ্দীনের কষ্ট একদম কমেনি। পানি খেতে গেলেই সে গন্ধ পেয়েছে। মনে হয়েছে পচা-গলা কোনো লাশের শরীরের জীবাণু জমে আছে পানিতে। তার কষ্ট খানিকটা লাঘব হয়েছিল, যখন দেখা গেল গত এপ্রিলের শুরুতে ডিবির পানির ট্যাঙ্কি থেকে জালালের লাশ উদ্ধার ও এই ঘটনায় জড়িত থাকার কারণে ইন্সপেক্টর জিয়াসহ নয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কষ্ট আরো বেড়েছে যখন ইন্সপেক্টর জিয়া জামিন পেয়েছে, জালালের পরিবার হয়েছে নিরুদ্দেশ। তবে সেও অবাক হয়েছে যখন শুনেছে এপ্রিলের শুরুতেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজান চৌধুরী ও তার পরিবারকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে।

মে মাসে নিহত টানবাজারের যৌনকর্মী মালার দাফন হবে—সেটা দেখার অপেক্ষায় ছিল নাজির। মালাকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল নদীতীরে। একইভাবে জুলাই মাসে খুন হওয়া যৌনকর্মী জেসমিনকে খুব গোপনে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবেই দাফন করে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম। অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে নাজিরের কি কান্না পেয়েছে, তার কি মালা কিংবা জেসমিনের মতো মনে হয়েছে, 'জীবনডারে কোন জীবনে থুই!' টাকাভর্তি ব্যাগ আর বোমা তৈরি ও বিস্ফোরণের দায়ে সাংসদ মানিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তবু নাজিরের অপেক্ষা শেষ হয় না। কারণ সব মানিকেরাই কেমন করে যেন রেহাই, জামিন বা নিস্কৃতি পেয়ে যায়।

এপ্রিলের শেষে একদল সংঘবদ্ধ প্রতারক বিটিভি কর্মকর্তা ও পুলিশের পরিচয় দিয়ে ডেমরা এলাকার বিভিন্ন বাসা থেকে লাইসেন্স না থাকার অপরাধে প্রায় শতাধিক টিভি সেট ট্রাকে উঠিয়ে চম্পট দেয়। সেরা প্রতারণার এই ঘটনার পর মাটি খুঁড়ে হলেও এই প্রতারক দলকে গ্রেপ্তার করাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—এটা দেখার অপেক্ষায় থাকে নাজির। কিন্তু মে মাসের ৫ তারিখ নাজিরের মতো সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া হামিদা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ১ হাজার ২০০ ছাত্রী রোদে পুড়ে আট ঘন্টা অপেক্ষা করেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেখা পায়নি। নাজিরের মতো ছাত্রীদর বড় আশা ছিল, তাদের স্কুলের একদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম তাদের স্কুলে আসবেন।

তানিয়া ধর্ষণ মামলার সাজানো আসামি ওবায়দুল হক মরা জামিন পেলে আইজউদ্দীন তার কষ্ট বাড়াবে কি না বুঝতে পারে না। তবে জুন মাসে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ ভালো ফলাফল করায় কষ্ট কমেছিল আইজউদ্দীনের। কিন্তু ঢাকা

স্টেডিয়ামের চার-চারটি মাসুম পিচের হত্যাকাণ্ডে কষ্ট বাড়ে তার। পুলিশ বিএনপি কর্মী মনি বেগমের শাড়ি ধরে টান দিলে মনভাঙা কষ্টটা লাঘব হয় আইজউদ্দীনের কাদের সিদ্দিকীর কথা শুনে। প্রথমে সংসদ থেকে ওয়াকআউট, পরে দল থেকে বহিষ্কার ও পদত্যাগ নাটকের পর কাদের সিদ্দিকী নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, 'মহাভারতের দুর্যোধনও দ্রৌপদীর শাড়ি ধরে টান দিয়েছিল। দুর্যোধন বেশি দিন টিকতে পারেনি, হাসিনাও পারবে না!' জুন মাসেই মোবাইল সেট চুরির অভিযোগে সাত বছরের শিশুকে গ্রেপ্তার ও পুলিশি নির্যাতন আর ডগ স্কোয়াডের প্রতিটি কুকুরের জন্য প্রতিদিন ৩ হাজার টাকা ব্যয়ের হিসাব জেনে কষ্ট বাড়ে আইজউদ্দীনের। তবে দুবাইতে চুরির ঘটনায় বিতর্কিত বিএনপি সাংসদ শহীদুল ইসলামের সংসদের বিবৃতি শুনে থ হয়ে যায় সে। শহীদুল ইসলামের বিবৃতি মতে, একাত্তরে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক থাকাকালে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দীন খান আলমগীর নাকি পাকবাহিনীকে মেয়ে মানুষ সাপ্লাই দিতেন।

৩ জুলাই পুলিশের একজন এসআই লাথি মেরে শাহ মোঃ টুকুকে পানিতে ফেলায় হতভাগা যুবকটির মৃত্যু হলে কষ্টে কেঁদে ফেলে আইজউদ্দীন। বিরোধী দলে গেলেও আর হরতাল করব না —শেখ হাসিনার এই ঘোষণার পরও ভোলায় হরতাল ডাকে যুবলীগ। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আ. জ. ম. নাছির ঢাকায় গ্রেপ্তার হলে চট্টগ্রামেও হরতাল ডাকা হয়। পুষে রাখা কষ্টটা দারুণ ক্ষোভে পরিণত হয় আইজউদ্দীনের যখন সে দেখে, পুলিশ আর শামীম ওসমানের ক্যাডার বাহিনীর মিলিত দল টানবাজার আর নিমতলীর অসহায় যৌনকর্মীদের জোর-জবরদস্তিভাবে উচ্ছেদ করে গাজীপুরের কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে মানবেতরভাবে আটকে রাখে।

ঘোষণা দেওয়ার পরে কবে শেখ হাসিনা পতিতালয়ের গেটে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসান সেটা দেখার অপেক্ষায় ছিল নাজির। অপেক্ষায় ছিল পরবর্তী ঈদের নামাজ হাইকোর্টের সামনের ঈদগায় পড়ার। কিন্তু বস্তি উচ্ছেদের পর জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের বস্তিকর্মীরা ঈদগা আর কামাল হোসেনের বাড়ির সামনে আশ্রয় নিয়ে হাগামুতা শুরু করে দিলে ঘেন্না ধরে যায় নাজিরের। সে অবাক হয় , যখন সে শোনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাহমুদুল হক সেশনজট সম্পর্কে বলেন, একজন ছাত্রী যখন তার ছয়-সাত বছরের বাচ্চাকে নিয়ে ক্লাস করতে আসে তখন শিক্ষক হিসেবে খুব ভালো লাগে না। তবে নাজিরের অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে যায়—যখন সে দেখে, ২৬ আগস্ট দিনে-দুপুরে ছিড়া আকবর আর ক্র্যাক কাদেরকে নিয়ে ইউসিবিএল দখল করে রাখে আখতারুজ্জামান বাবু ওরফে ব্যাংক বাবু! অসহায় কষ্টটা বুকে বড্ড বিঁধে আইজউদ্দীনের—যখন সে শোনে, সংসদে বিএনপির এক সাংসদ বলছেন, ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে ট্রানজিট নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আর কী খোলাখুলি হয়েছে আমি জানি না! আর সেপ্টেম্বরেই এরশাদ শিকদারকে নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া শুরু হলে আইজউদ্দীন ভাবে, পুলিশ ও সাংবাদিকরা কি এত দিন ঘুমিয়েছিলেন?

বারবার টাকার অবমূল্যায়নে ক্ষুব্ধ হয় আইজউদ্দীন। ধর্ষণজনিত আন্দোলনের কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এই বছরে ২৫৯ দিন ছুটি ছিল জেনে পুষে রাখা কষ্টটা ক্রোধে রুপান্তরিত হয়। রাগে-ক্ষোভে-কষ্টে আইজউদ্দীন ভাবে ঢাকা ছেড়ে বহু দূরে চলে যাবে সে। তখনই তার খালেদা জিয়ার কথা মনে হয়— 'প্রয়োজনে ৩৬৪ দিন হরতাল দেব।' সে খুঁজে বের করে নাজিরকে। নাজির বিজ্ঞের মতো বলে, আরো কিছু দিন ঢাকায় থাকি। অপেক্ষা করে দেখি সংসদ ছেড়ে স্পিকার আর দেশ ছেড়ে শেখ হাসিনা সর্বমোট কতদিন বিদেশে কাটান। অপেক্ষা করে দেখি, খালেদা জিয়া কত দিন হরতাল দেন আর শেখ হাসিনা কতগুলো ডিগ্রি আর পুরস্কার সংগ্রহ করতে পারেন। কড় কষ্টে ফিরে আসে আইজউদ্দীন । ভাবে, দেশ যখন ভারতের কাছে বিক্রিই হয়ে যাবে তখন ভারতেই পাড়ি জমাই। কিন্তু দিনাজপুরে এসে ভয় পায় সে। বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত হয়েছে কয়েকজন বাংলাদেশী। ভয়ে সে আবার এক হরতালের দিনে রাতের বেলায় ঢাকার বাস ধরে।

ভয় লাগে তার,এই বুঝি বাস পুড়িয়ে দিল। এই বুঝি কেউ পেট্রল বোমা মারল। ঘুম থেকে আংশিক জেগে সে বাস কন্ডাক্টরকে বলে, 'ভাই আমি কোথায়?' বাস কন্ডাক্টর জানায়, সে বঙ্গবন্ধু সেতুতে । তার ঘুম ভাঙে নাজিরের ডাকে। সে নাজিরকে জিজ্ঞাসা করে, আমি কোথায়? নাজির জানায়, সে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে।

সে সারা দিন নাজিরের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে কাটায়। বিকেলে সে যায় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু কাপ খেলা দেখতে । মারামারি বেধে যায় খেলায়। ইট এসে পড়ে আইজউদ্দীনের মাথায়। বড় কষ্টে অজ্ঞান হয়ে যায় সে। জ্ঞান ফিরে সে দেখে অপেক্ষায় নাজির। তার কাছে জানতে চায় সে এখন কোথায়? নাজির জানায়, আইজউদ্দীন এখন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে।

কষ্ট নিয়ে আইজউদ্দীন ভাবে, বঙ্গবন্ধু এখন মৃত। তবু তিনি হয়তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন। কবরে শুয়ে স্বপ্ন দেখার কাজটা সারতে কি এখন তাকে বঙ্গবন্ধু গোরস্তানেই ঠাঁই নিতে হবে?

নাকি হাসিনা ও খালেদা দেশকে শেষমেশ গোরস্তানে পরিণত করতে পারেন কিনা এই অপেক্ষাতেই দিন কাটবে নাজিরের?

ডিম ~~প্যাঁড়া~~ পড়া হুজুরের দরবারে

কাফির 'মেরুদণ্ডে' ব্যাথা করছে। সে নট নড়ন-চড়ন হঁয়ে আমার আর মুন্নার ঘাড়ে ভর দিয়ে বেবি টেক্সির মধ্যে একরকম শুয়ে আছে। আর বেবি টেক্সি নিজেই নেতিয়ে আছে কঠিন জ্যামের ভেতর।

কাফিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার যাত্রাটায় কুফা লেগে গেলো। এর ভেতরেই একজন, আমাদের তিনজনকে চমকে দিয়ে বলে উঠলো, 'ভাইজান কে কেমন আছেন?'

কাফি আর মুন্নার মুখটা বাংলা পাঁচ হয়ে গেলো। অনাহূতের নাম মঞ্জুর। পানি খাওয়ার মতো ডাইল খায়। সে নিশ্চয়ই ডাইলের খোঁজে এসেছে। কাফিকে দেখে মঞ্জুর বললো, 'অরে হুজুর সাইদাবাদীর কাছে লইয়া চলেন। হুজুর প্যারালাইসিস রোগীরে হান্ড্রেড মিটার দৌড়ের প্রতিযোগী বানাইয়া ছাড়ে আর মেরুদণ্ডের ব্যথা তো কেউচ্ছা (কিছু না)!

মঞ্জুর বেবি টেক্সি ড্রাইভারের পাশে সওয়ার হয়ে গেলো। গোলাপবাগ মাঠের কোনে নামলো কিছুক্ষণের জন্য। এক বোতল 'ডাইল' নিয়ে ফিরে এসে বয়ান করলো-এই ডাইলের ভেতর সাইদাবাদী হুজুরের আশীর্বাদ আছে। শুনেছি হুজুরের এক ভাই নাকি গোপনে-আড়ালে এই ব্যবসার দেখভাল করে। মঞ্জুর এই তথ্যদানের পেছনে একটি সাপ্তাহিককে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করলো।

মঞ্জুরের হাব-ভাব দেখে ওকে এক রকম তাড়িয়েই দিলো মুন্না। গোলাপবাগ মাঠের পর এবং আর কে চৌধুরী ডিগ্রি কলেজের আগে সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ডের শেষ সীমানার ঠিক পেছনে বিশ্বরোডের উপর অবস্থিত হুজুর ছাইদুর রহমান সাঈদাবাদীর (দরবার শরীফ, মসজিদ আর দরবার শরীফ কমপ্লেক্সের ত্রয়ী সাইনবোর্ডে হুজুরের নামের বানান এভাবেই লেখা আছে) আস্তানা। দরবার

শরীফের বাহারী গেটেই ঝুলে আছে 'ভাড়া হবে' সাইনবোর্ড। হুজুরের কোনো এক কমপ্লেক্সে অফিস ভাড়ার বিজ্ঞাপন। ডানপাশে লোহা-লক্কর, টায়ার আর গাড়ির যন্ত্রাংশের দোকান। দোকানগুলোর ঠিকানায় এই জায়গার নাম লেখা আছে 'ব্রাহ্মণ চিরণ'।

কাফিকে খানিকটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। যন্ত্রাংশের দোকানগুলোর পাশে ছয় তালা এক বিল্ডিঙের মাথায় মিনার গম্বুজ দিয়ে সাজানো। তার নিচে এক গোছা চাবি হাতে চেয়ার-টেবিল পেতে বসে আছে এক লোক। জানা গেলো হুজুর এখানেই থাকেন।

সামান্য দূরে আর একটা বিল্ডিঙের দেয়াল জুড়ে জ্যোতি হিমেল পাউডার আর মমতা টুথ পাউডারের বিজ্ঞাপন। এর বিপরীতেই আর এক গেট দিয়ে আমরা ঢুকে পড়ি হুজুর সাইদাবাদীর দরবার শরীফে। দরবার শরীফের পাশেই খানিকটা খোলা জায়গা। ইট ফেলে সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করা হচ্ছে। তার মাঝে এক সারি খুঁটির মতো বানানো হচ্ছে বাতির জন্য। মাঝে ঝরনার মতো চব্বিশটি কলের সমাহার। নিচে পচা পানি। শেওলা আর তার ভেতর পচা ঝাড়ু উল্টো হয়ে ভাসছে। পাশেই বাহারি টাইলস আর কাচশোভিত দ্বিতল মসজিদ। বড় সুন্দর। মোমিন বান্দাদের খেদমতে হুজুরের এই মসজিদ নির্মাণ শেষে এর উদ্বোধন করেছেন ঢাকার মেয়র আলহাজ্ব মোহাম্মদ হানিফ।

দরবার শরীফের গেটে টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসে আছেন এক হুজুর। তিনি পনর টাকার বিনিময়ে কাফির নাম ঠিকানা লিখলেন। আমরা কে জানতে চাইলে তাকে বলা হলো আমরা সহযোগী। পুরুষ রোগী বলতে মাত্র দুই জন। কাফি আর অন্য পুরুষ রোগী কী কারণে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায় এর উত্তরে জানিয়েছে ব্যক্তিগত সমস্যা।

গেটে বসা হুজুরের সঙ্গে আমরা দরবার শরীফের যে স্থানে প্রফেসর হুজুর (সাঈদাবাদী) বসে সেখানে ঢুকলাম। পুরুষ রোগী দুজন, মহিলা রোগী সাত-আটজন। আমরা বসে আছি এসি রুমে। দেয়ালে কাবা শরীফসহ বিভিন্ন মসজিদের ছবি। কাচ টাইলস ফরমিকা আর কাঠ দিয়ে ঘরের ভেতর প্রশস্ত একটা সিংহাসনের মতো বানানো। কাউকে বলে দিতে হয় না যে হুজুর সায়েদাবাদী এলে এখানেই বসবেন।

আওয়ামী লীগের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি কিংবা সিরাজউদ্‌দৌলার পতন দিবস যে কারণেই হোক না কেন রোগীর সংখ্যা কম আর সাঈদাবাদী হুজুরও আজ এলেন না। তার এক সহযোগী হুজুর রোগী দেখা শুরু করলেন। দরবারে লেডিস ফার্স্ট নয় জেন্টসই ফার্স্ট। কাফির সঙ্গেই সেই রোগি বললেন—তার বাতের সমস্যা। সহযোগী হুজুর (যে হুজুর রোগীদের নাম এন্ট্রি করেন তাকে সহকারী হুজুর ধরা হয়েছে) একটি লাঠি দিয়ে সেই বাতরোগীকে পিটানো শুরু করলেন। কাফি ভয়ে ভয়ে বললো, 'আল্লাহর কসম, আমার মেরুদণ্ডের ব্যথা ভালো হয়ে যাচ্ছে। কাফি ব্যথা চেপে সেই সহকারী হুজুরকে জানালো তার ছোটভাই এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছে। বাবা-মার কথাবার্তা শোনে না। এই বয়সেই নেশা-ভাং করে। তার জন্য সে হুজুরের কাছে এসেছে।

সহকারী হুজুর একটি আরবি লেখা ছোট্ট চারকোনা কাগজ কাফিকে দিয়ে বললেন, এটি ভিজিয়ে খাওয়াবেন। ছোটভাই এবং তার ছবিসহ শুক্রবার দিন খাস দরবারে কাফিকে তিনি আসতে বললেন। কাফি জানতে চাইলো—এটা কী দিয়ে ভিজিয়ে খেতে হবে? মহিলা রোগীদের সারিতে বসে থাকা ভ্রূ প্লাগ করা বেনজির ভুট্টো স্টাইলে ওড়না দিয়ে মাথা পেঁচানো এক মহিলা বলেই ফেললেন 'বোকা ছেলে। এটা আর জিজ্ঞাসা করতে হয়? পানি দিয়ে ভিজিয়ে খাবেন।'

আমি আর মুন্না কাফিকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মেরুদণ্ডের ব্যথায় বেচারা কাফি ঠিকমত হাটতে পারছে না। ফেরার সময় সে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লো। আরবি লেখা মূল্যবান কাগজটা কোন পানি দিয়ে ভিজিয়ে খাওয়াবে? ওয়াসার পানি নাকি অন্য কোনো মিনারেল ওয়াটার?

রূপান্তর

মধ্যবিত্ত একজন পুরুষ কিংবা নারীর কোটিপতি হওয়ার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় কী?

'একজন নারীর উচ্চবিত্ত বনিবার সর্বাপেক্ষা সোজা পথ একজন উচ্চবিত্তকে বিয়ে করা আর একজন পুরুষের উচ্চবিত্ত বনিবার সর্বাপেক্ষা পরীক্ষিত পথ আমানউল্লাহ আমান কিংবা নুরে আলম সিদ্দিকীর মতো কোনো সফল আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা।' অবশ্য একজন পুরুষের জন্য কোটিপতি বনে যাওয়ার আরো একটি একটি উপায় আছে। পীর বনে যেয়ে কোনো মাজার বা দরবার শরীফ সাজিয়ে বসা।

স্বাধীনতার পর মুন্সীগঞ্জের জনৈক 'ছাইদ মিয়া' পল্টন বায়তুল মোকারমসহ আরো বিভিন্ন জায়গায় ছিট কাপড় ও বই ফেরি করে বেড়াতেন। ক্ষুদ্র ব্যবসা দিয়ে কোটিপতি হওয়ার বৈধ নজির এই বাংলাদেশেই আছে। সেগুলো যে কারো বড় হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণামূলক। আর সাঈদাবাদীর ব্যাপারটা কেমন? *লালসালু* উপন্যাসের মত হঠাৎ করে মাজার সাজিয়ে বসার। তবু জানা যায়, এক লোক কানে কম শুনতো। হুজুর এটা জেনে ওই লোকের কানে সজোরে থাপ্পর মারেন। কী তামশা, ওই লোকের কান বিলকুল ভাল ফকফকা অর্থাৎ মুহূর্তে ভালো হয়ে যায়। আর নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি আছে ভেবে হুজুর নিজেই পীর বনে যান। তবে প্রকৃতির কী যে বিচার! হুজুর নিজেই এখন কানে কম শোনেন। তাই কষ্ট করে বড় লোক হওয়ার চেয়ে তিনি সহজ পথটাই ধরেছিলেন। সত্তরের দশকের শেষে ব্রাহ্মণ চিরণে একদিন দেখা গেলো হুজুর সাঈদাবাদীর কাঠ আর টিনঘেরা দরবার। পরে এরশাদ আর তার মন্ত্রিপরিষদের দু-একজনের কল্যাণে কোটি টাকার সম্পত্তি মাত্র এক টাকার বিনিময়ে দখল করে নেন এই হুজুর।

এরশাদের পতনের কয়েক বছর আগেই একটা কারণে হুজুর সাঈদাবাদী কিছু দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন হতেন। কারণটি ছিল হুজুরের অলৌকিক দোয়ায় নাকি নিঃসন্তান দম্পতিরা সন্তান লাভ করে থাকেন। হুজুরের দোয়ার কেরামতি নিয়ে তখনই ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক 'এক্স-রেটেড' গল্প। সন্তানকামী মহিলারা যে সন্তান লাভ করেন তাদের অনেকের চেহারা নাকি হুজুরের মতো হয়।

হুজুর সাঈদাবাদী ১৯৯০ সালে তার ছেলের নামে বাজারজাতকৃত জ্যোতি হিমেল পাউডারের বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশের সব নামী-দামী মডেলদের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন। যে পণ্যের বিজ্ঞাপনে মন্ত্রীরা এবং একটি 'বিশেষ ধরনের' পত্রিকার ডক্টর সম্পাদক মডেল হন সেটা নিয়ে তো তোলপাড় হবেই, প্রফেশনাল মডেলদের ঘুম হারাম হবেই।

হুজুর সাধারণত নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তানলাভের উদ্দেশে কলা পড়া, ডিম পড়া দিয়ে থাকেন। এই কলা পড়া আর ডিম পড়া কিংবা লোহার বল সোনা হয়ে যাওয়া যে নিম্নশ্রেণীর জাদুকরদের দেখানো জাদু মাত্র তা দেশের বাইরেও প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ ছাইদ মিয়া হুজুরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। হুজুর চ্যালেঞ্জে হেরে যাওয়ার পর কলকাতায় বসেই তার কাজে সাহায্য করার জন্য প্রবীর ঘোষকে অনুরোধ করেছিলেন। প্রবীর ঘোষ অবশ্য হুজুরকে সাহায্য না করে '৯১ সালের ৭ এপ্রিল ভারতের *আজকাল* পত্রিকায় 'ডিমের কুসুম ও কলায় সন্তান' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন।

অবশ্য হুজুরের ভারতগমন এখনো থামেনি। তিনি প্রায় আজমীর শরীফে যেয়ে থাকেন। যার দোয়ায় সবধরনের রোগ-শোক ভালো হয়, সন্তান হয় সেই তিনিই গত বছর তার মেয়ের অসুখের কারণে মেয়েকে নিয়ে কলকাতা যান!

সেখানে দুজন মহিলার সাথে প্রতারণা করার দায়ে হুজুরকে গ্রেফতার করেছিল কলিকাতা পুলিশ। জানা যায়, দেশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, মন্ত্রীরা হুজুরকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তদ্বির করেছিলেন। দেশে ফিরে হুজুর অবশ্য তার এই গ্রেফতারকে ষড়যন্ত্র এবং এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আর এক কথিত পীর শের-এ-খাজাকে দায়ী করেছিলেন।

চক্র

কাফি সিমু নাসেরকে ছোট ভাই বানিয়ে তার পাসপোর্ট সাইজ ছবি ম্যানেজ করে আমার সঙ্গে রওয়ানা হলো। হুজুর দর্শনে আর কথা না-শোনা ছোট ভাইয়ের জন্য পথ্য জোগাড়ে।

শুক্রবার। বেলা পৌনে বারোটা। হুজুরের খাস দরবারের সামনে দুজন বয়স্ক মানুষ ও একজন মহিলা চেয়ার নিয়ে বসে আছেন। মহিলার চুল রং করা। হাতে মোবাইল। হুজুর আসছেন না। পুরুষ দর্শনার্থীরা ক্রিকেট আলোচনায় মেতে আছেন। তাদের ভেতর দুজন বাংলাদেশের দুটো রঙিন ট্যাবলয়েডের ভেতর নায়িকাদের ছবি ও কথামালা পড়তে ব্যস্ত।

বুঝলেন ভাই, জিতলেই সব সঠিক, হারলেই ওয়াসিম আকরাম ঘুষ খেয়েছে— এমন মেন্টালিটি ঠিক না। বললেন একজন।

গালে বড় তিল আছে এমন এক দর্শনার্থী উত্তর দিলেন— 'না ভাই ঠিক না। ধরেন সবাই জানে আপনি স্ট্যান্ড করবেন পরীক্ষায়। আপনি স্টার কিংবা ফার্স্ট ডিভিশন পান অন্তত! নিদেনপক্ষে পাস তো করবেন। কিন্তু যখনই পাকিস্তানের মতো ফেল করবেন তখনই তো...'

তিলওয়ালা শেষ করতে পারলেন না। এর মধ্যেই লেটেস্ট মডেলের এক সাদা গাড়িতে এসে নামলেন হুজুর। গাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে সাদা আলখাল্লা পরেছেন। আলখাল্লার ওপরে সোনালি বোতামওয়ালা কালো কোট। মুজিব কোটের হাতা নেই, হুজুরের কোটের বাহারি হাতা আলখাল্লাকে অন্যরকম রূপ দিচ্ছে।

হুজুর এগিয়ে এলেন। রঙিন চুলের মোবাইল হাতে ভদ্র মহিলা তাকে যেন সংবর্ধনা জানালো। দর্শনার্থীরা যেখানে জুতো স্যান্ডেল খুলে ঢুকেছে, হুজুর সেখানে জুতো নিয়েই ঢুকলেন। সশব্দে বন্ধ হলো হুজুরের খাস দরবার, সঙ্গে বেরুলেন সেই মহিলা ও আর এক পুরুষ। কিছুক্ষণ পরেই হুজুরের এক চ্যালা শব্দ করে বললো— জুমার নামাজ শেষে হুজুর আপনাগো দেখবেন। আপনারাও নামাজে যান।

নামাজ শেষে মিলাদ। জিলাপি আর হুজুরের আনা আবে জম জমের পানি নিয়ে ফিরছে নামাজীরা। হুজুর তার সহযোগী, যার ভেতরে তার দুই সহোদরও রয়েছে, নিয়ে ঢুকলেন তার খাস দরবারে। এক পাশে পুরুষ ও অন্যপাশে মহিলারা সারি বেঁধে হুজুরকে ঘিরে বসলেন। পুরুষ দর্শনার্থীরা আগে। হুজুরের সিংহাসনের মতো জায়গাটায় অনেকেই হাঁটু গেড়ে বসেছে। প্রথম দর্শনার্থী তার নাম বললেন হুজুরকে। হুজুরের এক চ্যালা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন 'হুজুর কানে কম শোনেন, জোরে বলেন, জোরে বলেন।' প্রথম দর্শনার্থী মিন মিন করেই বললেন তার সমস্যা। হুজুরের চ্যালা চিৎকার করে রিপিট করলো, 'হুজুর উনি জোর পান না।'

হুজুর সুধালেন আপনি বিয়ে করেছেন?

দর্শনার্থী বললো, 'হুজুর বউ তো একটা আছেই। নতুন আরেকটা করতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে আইলাম।' নতুন বউয়ের ছবিসহ আসতে বলা হলো তাকে, ধরিয়ে দেয়া হলো আরবি লেখা ছোট্ট কাগজ, যা কাফিকেও দুদিন আগে ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

গালে তিলওয়ালা দর্শনার্থী, পাকিস্তানের ক্রিকেট নিয়ে যিনি মারমুখো বক্তব্য রাখছিলেন দর্শনার্থীদের আড্ডায়, তিনি হুজুরের সামনে নেতিয়ে পড়ে বললেন, 'হুজুর, এক বছর প্রেম করার পর বিয়ে কইরা দেহি আমার বউয়ের রেডিমেড এক পোলা এক মাইয়া আছে।'

সাঈদাবাদী হুজুর খুব বিজ্ঞের মতো বললেন, 'কেউ না বুঝলেও আমি বুঝেছি আপনার বউয়ের আগে বিয়ে হয়েছিল। কোনো ব্যাপার না।' তাকেও আসতে বলা হলো বউয়ের ছবিসহ। সঙ্গে এক আরবি লেখা কাগজ।

ইদ্রিস নামের এক ভদ্রলোক যিনি থাকেন হুজুরের গ্রামের বাড়ির পাশে, তার গরু চুরি হয়েছে। তার খুব আশা হুজুর বলে দিতে পারবেন যে, কে চুরি করেছে।

হুজুর তখন হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি এতো কিছু পারি চোর ধরতে আর চুরির মাল উদ্ধার করে দিতে পারি না। এগুলান পুলিশের কাম।'

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়েছে এমন একজন চাকরির জন্য হুজুরের দোয়া চাইতে এসেছে। এসেছে জগন্নাথ কলেজের বাংলার ছাত্র। বাংলাদেশ নেভিতে পরীক্ষা দেবে এমন একজন এসে বললো, 'হুজুর কাইল রাতে আপনেরে স্বপ্ন

দেইকছি। আইজ চইলাই আইলাম।' একজন তো কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'হুজুর আপনের ডিম পড়া খাইয়া আমার যে পুলা হইছিল, জন্মের দিনই হে মারা গেছে।' হুজুর তাকে পুনরায় ডিম পড়া নিতে বললেন।

পরীক্ষায় ফেল আর বাবা-মার কথা না শোনার দায়ে কাফির জোগাড় করা ছোটভাই সিমু নাসেরকে হুজুর সাইদাবাদী সেই একই আরবি লেখা আয়াত ধরিয়ে দিলেন। আগের আরবি লেখা আর এই লেখা আয়াত ভিন্ন। লিখেছেও দুজন। তবে হুজুর লেখেননি এটা নিশ্চিত। কারণ হুজুর নিজেই বহুবার স্বীকার করেছেন কোনো লাইনেই তিনি বেশি দূর লেখাপড়া শিখতে পারেননি। অথচ পুরুষ দর্শনার্থীদের সর্বশেষ দুজন মাদ্রাসার ছাত্র। তারা পড়ালেখা সংক্রান্ত দোয়া চাইলো হুজুরের কাছে। বললো, 'হুজুর রাইতে যা-ই পড়ি কিছুই মনে থাকে না।' হুজুর বিজ্ঞের মতো বললেন, 'এখন থাইকা দিনে পড়লেই পারেন।'

পুরুষ দর্শনার্থী খুব কম থাকায় মহিলা দর্শনার্থীরা হুজুরের কথায় হো হো করে হেসে উঠলো।

তাবিজের জন্য হুজুরের ফার্মেসিতে এলাম। দশ টাকার বিনিময়ে তাবিজ। এখানে জোর পাওয়ার জন্য তেল পড়া, পানি পড়া, গোলাপজল, অশ্বগন্ধারিষ্ঠ, সাদা কালো বড়ি পাওয়া যায়। এতো কিছু থাকতে আমি বললাম, ভাই আপনাদের এখান থেকে নাকি একটি পত্রিকা বের হয়। এক কপি দেখা যাবে?

ভদ্রলোক সম্ভবত হুজুরের সহোদর, সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, *সাঈদিয়া দরবার* পত্রিকা নাই। খুব চাহিদা তো। কোথাও পাওন যায় না।

ভাবলাম উনি ঠিকই বলেছেন, এমন পত্রিকা, এমন পাউডার, এমন জোরের ওষুধ, এমন হুজুর এই ব্রাহ্মণ চিরণে সায়েদাবাদ দরবার ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে?

আসলে এমন হুজুর আর তার মুরিদানদের ভেতর আন্তঃসম্পর্কটা বহু বছর ধরে একই রকম আছে। মুরিদানরা বেচারা জনগণের মতো কিছু পেতে চায়, আর হুজুর কিংবা এমন পীররা রাজনীতিবিদদের মতো কিছু দিতেই চান। এই চক্র হয়তো ভাঙার নয়। তাই অশিক্ষিত অবুঝ সাধারণ মানুষের ভিড়ের অভাব হয়তো কখনোই হবে না সায়েদাবাদী হুজুরের দরবারে।

রাজনীতির শিশু শ্রমিক

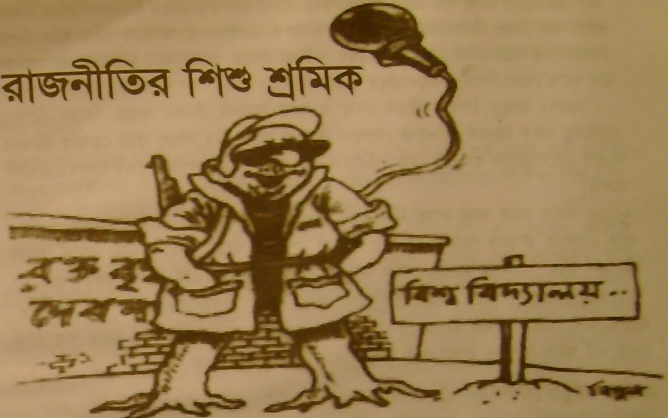

ফারুক মাজহার রাজু। মেধাবী ছাত্র ছিল বলেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরেছিল। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, স্বভাবে জোকার এই ছেলেটার আনন্দের কমতি ছিল না কোনো। শিক্ষককে অনুকরণ করা, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ একই টোনে বলতে পারা, নিত্যনতুন ভালগার জোকস সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাজনীতির প্রতি একরকম রোমান্টিসিজমও জন্মে গেল তার। মন খারাপ হলেই বলত, দাঁড়া মিছিলে গিয়ে এরশাদবিরোধী স্লোগান দিয়ে গরম হয়ে আসি! কখনো-সখনো এভাবে দারুণ গরম হয়ে গেলে রাজু বালতিভরতি পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বুয়েটের সোহরাওয়ার্দী হলের দোতলার কোণায়। শিবিরের মিছিল বের হলেই মিছিলকারীদের পানি মেরে ভিজিয়ে দিয়ে বলত আহ্ কি আরাম, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানি ....।

নব্বইয়ের সাতাশে নভেম্বর এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে যোগ দিতে বুয়েট থেকে রাজুও গিয়েছিল। এরশাদের তৎকালীন পাণ্ডাখ্যাত নীরু, অভি, মাসুদ সংদের সঙ্গে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তখন তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়েছে। ডা. মিলন নিহত হওয়ার মিনিট দশেক আগে টিএসসির কোণায় রাজুও গুলিবিদ্ধ হলো। ডান হাতে একটা আর বাম পায়ে দুটো বুলেটের স্বাদ নিয়ে খানিক সহযোদ্ধাদের কাঁধে চড়ে খানিক রিকশায় চড়ে এসে নির্বিকার শুয়ে থাকল ঢাকা মেডিকেলে। ছাত্ররাজনীতির এই পরিণতি অথবা রোমান্টিসিজমের চূড়ান্তে উঠে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে চিৎকার করে বলল, 'স্বৈরাচার নিপাত যাক!'

ডাক্তার বলে দিলেন, তিন-চার দিনের ভেতর দেশের বাইরে না নিয়ে গেলে ডান হাত বাম পা দুটোই কেটে ফেলতে হবে রাজুর। বুয়েটের ছেলেরা নামল রাস্তায়, গণচাঁদা উঠাল। রাজুকে বাঁচাতে হবে।

এরপরের ঘটনা খুব ছোট। রাজু ফিরে এলো ব্যাংকক থেকে চিকিৎসা নিয়ে। বাম পায়ে ভর দিয়ে ঠিকমতো হাঁটতে পারত না। আজীবনের অভ্যাস ডান হাত দিয়ে লেখাও বন্ধ হয়ে গেল। রাজু সে বছর পরীক্ষা দিতে পারল না। জীবনের প্রয়োজনে বাম হাতে লেখা শিখে, কোনোক্রমে উতরে নিলো। তার শিক্ষা জীবন।

অথচ! রাজুর শিক্ষা জীবন শেষ হওয়ার আগেই মিলন হত্যা কিংবা বিভিন্ন সন্ত্রাসের দায়ে বহুবার অভিযুক্ত গোলাম ফারুক অভি '৯১ সালে তার ফেরার জীবনে আশ্রয় পেয়েছিলেন রাজুরই এক পরিচিত বন্ধু খোকনের কল্যানে সেই সোহরাওয়ার্দী হলেই!

২০০০ সালে এসে রাজু হচ্ছে বিবাহিত, সাধারণ চাকরিজীবী, এক সন্তানের জনক। আর গোলাম ফারুক অভি? মাননীয় সংসদ সদস্য! রাজুর ছেলে যদি এখন তাকে জিজ্ঞেস করে 'তোমার মতো হওয়া ভালো, নাকি অভি হওয়াই লাভজনক?' বাম পা আর ডান হাতকে সামনে রেখে বুক ভাঙা কান্না ছাড়া ছাত্রজীবনের 'বিশাল জোকার' রাজুর আর কোনো উত্তর আছে কিনা, ওকে জিজ্ঞেস করা যায়নি! দশ বছর পর রাজু তোর এই ঘটনা লিখতে হলো বলে তুই আমাকে মাফ করে দিস বন্ধু!

মাতাল তাত্ত্বিক

ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ একবার বিবৃতি দিয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন ছাত্র সংগঠনের বাঘা বাঘা নেতারা। পাল্টা বিবৃতিতে তারা বলেছিলেন 'সাহাবুদ্দীন আহমদ যে প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন' তা নাকি ছাত্ররাজনীতি বা আন্দোলনেরই ফসল। হায়, এরপর হয়তো শোনা যাবে সাহাবুদ্দীন আহমদকে প্রেসিডেন্ট বানানো কোনো কোনো ছাত্রসংগঠনের দাবি ছিল!

গোলাম ফারুক অভি কিংবা ইলিয়াস আলীরা যে এমপি হতে পারেন মেনে নিচ্ছি সেটাও ছাত্র আন্দোলনের ফসল (!) কিন্তু শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ পর্যন্ত যে ৬৩ জন ছাত্র, টোকাই কমচারী বা বহিরাগতের লাশ পড়েছে, সেটাও কি ছাত্র আন্দোলনের ফসল নয়? সন্ত্রাসের কারণে তিন বছরের কোর্স যে সাত বছরে শেষ হয় না সেটা ও কি ছাত্র আন্দোলনের ফসল নয়? এশিয়ার প্রথম ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেতরে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আসে না সেটাও কি কোনো না কোনো ভাবে ছাত্ররাজনীতির ফসল নয়?

আর ছাত্ররাজনীতি থাকবে না বন্ধ করে দেওয়া হবে, সে বিতর্ক উঠলেই টেনে নিয়ে আসা হয় '৫২, '৬৬ '৭১ কিংবা '৯০-এর গণ-আন্দোলনের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহকে। বলা হয়, যারা আসলে ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে তারা দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যেতে চায়।

হায়, জাতির কোনো সময়ের বিশেষ প্রয়োজন এমন এক জোয়ার যে, সেই জোয়ারে সবাই ভেসে যাবে। কাউকে উদ্বুদ্ধ করার তেমন কোনো প্রয়োজন পড়বে না। উদ্বুদ্ধ করার মন্ত্রকে অস্বীকার না করেই বলা যায় বাংলাদেশ স্টাইলের ছাত্ররাজনীতি ইন্দোনেশিয়ায় নেই, তবু ছাত্ররা ক্যাম্পাসের গণ্ডি ছেড়ে সুহার্তোকে হঠাতে কি রাস্তায়

নামেনি? ফিলিপাইনে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতর রাজনীতি করা যায় না, কিন্তু মার্কোস-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা কি রাস্তায় নামেনি? আসলে নিজের মদপানকে জায়েজ করার জন্য অন্যদেরও মদাসক্ত করে গড়ে তোলা ছাত্র নেতাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

শিশু শ্রমিক

আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বিস্কুট কিংবা পাউরুটি খেয়ে থাকি। যে কেউ যদি এসব
তৈরির কারখানায় যান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পচা ডিমের সমাহার, গা ঘিন ঘিন করা
অবস্থা দেখে তৈরির পরে এসব খেতে চাইবেন না।
বিদেশী কাউকে যদি নেতা তৈরির কারখানা দেখাতে এ দেশের কলেজ
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়, নির্ঘাত তাদের বমি আসবে। তারা
নির্ঘাত বলে দেবে, 'এসব তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, নেতা তৈরির কারখানাও নয়, নির্ঘাৎ
ডাকাত তৈরির গ্রাম!' বিশ্ববিদ্যালয়কে ডাকাতদের গ্রাম উপমা দেয়ার জন্য আল
মাহমুদকে বিউগল বাজিয়ে সংবর্ধনা দেওয়ার সময় এসে গেছে! গার্মেন্টসের কোটা বা
তৈরি পোশাক রফতানি নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকা-ব্রিটেন-ইউরোপের একটা
ব্যাপারে প্রায়ই বিতর্ক বেঁধে যায়। এরা বাংলাদেশী গার্মেন্টসগুলোতে কর্মরত
শিশুশ্রমিকদের নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার
অমানবিক উল্লেখ করে এরা মুরব্বিসুলভ প্রতিবাদ জানায়।
হায়, আমেরিকা-ব্রিটেন-ইউরোপের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলো বুঝতে চায় না,
শিশুশ্রমের অমানবিক ব্যবহার এ দেশের যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে সবচেয়ে বেশি হয়
সেগুলো এ দেশের নামকরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, গার্মেন্টস শিল্প নয়। প্রিয় পাঠক,
বিশ্বাস হচ্ছে না? বিখ্যাত লেখক আহমদ ছফা বলেছেন ছাত্রসংগঠনের নেতা বা কর্মীরা
হচ্ছে রাজনীতির শিশুশ্রমিক। দয়া করে অমানবিকভাবে এদের এই পথে খাটিয়ে মৃত্যুর
দিকে ঠেলে দেবেন না!
উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে শিশুশ্রমিকদের অমানবিক ব্যবহার
নিয়ে প্রশ্ন তোলে না কেন? তাতে যদি কিছু হয়! প্রেসিডেন্ট সাহেব কিংবা মুহাম্মদ
জাফর ইকবাল এসব নিয়ে লেখালেখি করলে বিতর্ক বেঁধে যায়। অবশ্য আমেরিকা-
ইউরোপের দেশগুলো এ প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু বলবে বলেও মনে হয় না।
কারণ যে রাজনীতিবিদরা এর প্রতিবাদ জানাবেন তাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু
পড়ালেখা করে ওই ইউরোপ-আমেরিকাতেই!

আপন প্রেমিক

আল মাহমুদ কিংবা শামসুর রাহমান হয়তো প্রচুর বাজে কবিতাও লিখেছেন, তাই বলে
কি তাদের লেখা অসংখ্য ভালো কবিতার আবেদন ম্লান হয়ে যাবে?
কখনো না। ছাত্ররাজনীতির নামে ছাত্রনেতা, উপনেতা, পাতিনেতা, নেতাদের
নেতারা এখন শুধু বাজে কাজই করছেন। তাই বলে কি তাদের পুরনো কীর্তিগাথা ম্লান
হয়ে যাবে? না লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য মসলিনের মতো সেগুলো 'ইতিহাস জাদুঘরে' রক্ষিত

থাকবে? কিন্তু যেগুলো জাদুঘরের বাইরে ঘোরাঘুরি করবে সেগুলো কী? নিচের ঘটনাগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন!

সাতজনকে একসাথে গুলি করে মারবেন? জায়গা পাচ্ছেন না? নিয়ে চলে যান মুহসীন হলে । অতঃপর কোনো 'প্রধান' ভাইকে ধরে ব্রাশ ফায়ার করুন। বড়জোর যাবজ্জীবন হবে, তবে ক্ষমতার পালাবদল হলেই বেরিয়ে আসবেন।

বেশি না, ধর্ষণে একবার মাত্র সেঞ্চুরি করবেন? চলে যান জাহাঙ্গীর নগরে, সাহায্য নিন কোনো মানিক ভাইয়ের। পুরস্কার হিসেবে আমেরিকায় যেতে পারবেন। ময়েজউদ্দিনের মতো কোনো নেতাকে খুন করতে চান? 'গাজী' হয়ে চলে যান কালীগঞ্জে। প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরি মারুন, বড় জোর দু-এক বছর জেল খাটতে হবে। বেরিয়ে এলেই সাংসদ পদে মনোনয়ন পাবেন।

এমনকি এরপর সরাসরি রাজনীতি ছেড়ে দিলেও গুলশানের কোনো জায়গায় রেস্ট হাউসের ব্যবসা জাঁকিয়ে বসুন। আপনার এই রেস্ট হাউসে কেউ মেয়ে নিয়ে 'বোতল' টানতে এসে ধরা পড়লেও ক্ষতি নেই, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের লোকজন আপনাকে রক্ষা করতে ছুটে যাবে, অভিনেত্রীকে বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলতে পারবেন! এত বড় কাজ করতে ভয় হচ্ছে? ছোট কাজ করবেন? নিদেনপক্ষে কোনো ব্যবসায়ীকে ধরে এনে বিশ্ববিদ্যালয় হলে আটকে রাখুন। নতুবা স্কুলছাত্র অপহরণ করে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে গুনে গুনে টাকা বুঝে নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপদ এলাকায় বসে। যদি মনে করেন এসবেও ঝুঁকি আছে তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলের গাছগুলো কেটে বিক্রি করতে থাকুন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এত সুবিধা যখন ছাত্ররাজনীতি থেকে, আপনার দূরে সরে থাকা সাজে? সময় থাকতে তাই 'আপন প্রেমিক' হন। রাষ্ট্র বোঝার দরকার নেই, নিজ গৃহটাকে ভালো করে বোঝেন। দায়িত্ব বোঝার দরকার নেই নিজ প্রতিষ্ঠানকে বোঝেন। বমি বোঝার দরকার নেই, ভালো করে হজম করতে শিখুন। বিকশিত দেশ ও জীবনের জন্য শিক্ষা বোঝার দরকার নেই, সন্ত্রাসকে বোঝা গেলেই হয়ে যাবে বেশ!

সবকিছু নষ্টদের অধিকারে গেল!

ভালো শিক্ষক আপনি, তাহলে কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হতে পারবেন না। ভালো ছাত্র পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন যৌবনে, এমনকি পিএইচডি পর্যন্ত করে ফেলেছেন, কেউ আপনাকে সাংসদ হিসেবে মনোনয়ন দেবে না। ছাত্রজীবনে অস্ত্রহাতে মারামারি করেননি, গাড়ি ভাঙচুরে নামেননি, কেউ আপনাকে মনেও রাখবে না। হায়, সবকিছু নষ্টদের অধিকারে চলে গেল!

তাই যখন ছাত্রদের রবিনহুড কিংবা মাসুদ রানা পড়ার বয়স ঠিক তখনই তাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় সুইডেন আসলাম কিংবা সানজিদুল হাসান ইমন। যে সে ব্যক্তি নয়, এদের নিয়ে সংবাদের শিরোনাম হয়। পকেটে কলম থাকার চেয়ে তখন ভালো লেগে যায় পিস্তল। নেমে পড়ে সে নষ্টদের দলে। হায়, বয়সেরও কিছু দোষ থাকে। ছাত্ররাজনীতির ঘূণ যাকে ধরে, জীবনের সবটা বলি দিয়েও তার যেন প্রায়শ্চিত্ত করা শেষ হয় না!

পার্থ তোর মৃত্যু আমায় অপরাধী করে দেয়!

পার্থপ্রতিম আচার্য। কবিতা লিখতে গিয়ে ছন্দ মিলত না। নিজেকে ভাবত ফ্লপ কবি। লেখালেখির সূত্র ধরে একটি দৈনিকে কাজও করেছিল বেশ কিছুদিন । রাজনীতির নেশা ঢুকে গিয়েছিল রক্তে। জগন্নাথ হলে নামা রাতের নির্জনতা ভেদ করে হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠত, 'দিনবদলের স্বপ্ন আমার এখনো গেল না!'

বিয়ে করেছিল পার্থ। ওর বউ লিলি মা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল! রাজনীতির কারণে ঠিকমতো পড়ালেখা করতে না পারার চিন্তাটা তখন ওকে কুঁরে কুঁরে খাওয়া শুরু করেছিল। চিন্তামগ্ন থাকলেই জিজ্ঞেস করতাম, 'এই পার্থ, কী হয়েছে রে?' পার্থ নিঃশব্দে একটা সিগারেট আমার মুখে তুলে দিয়ে ম্যাচের কাঠিতে আগুনে জ্বালিয়ে বলত, 'কিচ্ছু না বড় ভাই, একটু মুখাগ্নি করুন।'

সেই পার্থ আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে '৯৮ এর এপ্রিলের একদিন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে বুকে বুলেট নিয়ে ঢাকা মেডিকেলে এসে জীবনটাকে শেষ করে ফেলল। ওর শরীরের খুব দামি 'ও' নেগেটিভ রক্ত সারা ক্যাম্পাস রঞ্জিত করে শুধু কি এটাই বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে, ছাত্ররাজনীতির নামে যা কিছু আছে তার পুরোটাই জঘন্য নেগেটিভ?

খবর পেয়ে দেখতে গেলাম পার্থকে। গিয়ে দেখি জগন্নাথ হলের পূজামণ্ডপের ভেতর 'লাশ' হয়ে পড়ে আছে ও। মুখটা খানিক হা হয়ে আছে। মনে হলো, পার্থ যেন বলেই ফেলবে, 'কিচ্ছু না বড় ভাই, একটু মুখাগ্নি করুন।'

মহাজ্বালা হলো। সিগ্রেটও খেতে পারি না। আবার কাঁদতেও পারি না। নেতা-মন্ত্রীরা আসছেন, ছাত্রলীগ নেতারা ছাত্রদলকে গালাগালি করছে, আমি কারো ওপর রাগও করতে পারছি না। পার্থর লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওর গ্রামের বাড়িতে, আমি ওর সঙ্গও ত্যাগ করতে পারছি না।

পার্থর বউ লিলিকে দেখলাম। তাও ভাবান্তর হলো না। বৃষ্টি নামল। ভাবলাম, পৃথিবীটাও পার্থর জন্য কান্না শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু তারপর। পার্থকে চিতায় নেয়ার আগে ওর পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে যখন লিলির মাথার সিঁদুর মুছে ফেলা হলো, মেঘের মতো গর্জন করে কান্না পেল আমারও। ভাবলাম পার্থ হয়তো এখনই বলে ফেলবে, 'ও কিচ্ছু না বড় ভাই, একটু মুখাগ্নি করুন!'

প্রধানমন্ত্রী কিংবা আরো অনেক অনেক নেতা-মন্ত্রীর পুত্ররা বিদেশে পড়ালেখা করেন। হায়, তাদের একজনের পরিণতি যদি পার্থের মতো হতো! বড় নিষ্ঠুরভাবে যদি পার্থদের পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে তুলে ফেলতে পারতাম রাজনীতির বড় বড় নেতা-মন্ত্রীদের চুলের সিঁথিতে লাগানো এসব নেগেটিভ রাজনৈতিক রক্তমাখা সিঁদুর!

ছাত্ররাজনীতি করার কারণে কেউ যদি নিহত হয় তবে তাকে শহীদ উপাধি দেওয়া হয়। সুতরাং দেশের সব অস্ত্রময় ক্যাম্পাসগুলোতে যারা বেঁচেবর্তে পড়ালেখা করতে সক্ষম হয়, তাদের নির্দ্বিধায় 'গাজী' বলা যেতে পারে। এ লেখাটি সেসব গাজীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

ক্ষমতাই সকল ভালোবাসার উৎস

আমাকে হত্যা করার আগে
আমার হৃদয়টাকে
কোনো ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে ছুড়ে দিও।
ওটা কোনো কাজেই আসেনি!

কার্টুনিস্ট আহসান হাবিবের মৌলিক শের সংকলন তুমিতে এই শেরটি আছে। আমরা এই শের পড়ে কী বুঝতে পারি? কারো কারো হৃদয় দীর্ঘদিন কোনো কাজে আসে না। অর্থাৎ ভার্জিন থাকে। 'হৃদয় খালি আছে' এমন বিজ্ঞাপন দিয়েও ভালোবাসার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ যারা হৃদয়ের স্বেচ্ছাচারী কারবার করে হৃদয়টাকে শত ছিদ্র করে ফেলেছেন, তাদের নাকি প্রেমিকার অভাব হয় না। আসলে ভার্জিন হৃদয়ের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে না বলে কেউ হয়তো কিনতে চায় না।

আর আজিজ মোঃ ভাই কিংবা হু. মো. এরশাদ মার্কা হৃদয় কিনতে তিন মাইল লম্বা লাইন লাগে! এ কারণেই হয়তো আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন লিখেছিলেন, 'তোমাকে বলতে গেছি ভীরুপায়ে, আই লাভ ইউ, সেখানেও কিউ!'

ডেটিং প্লেস

সাত বছর পর তুনাবী ও মুনাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল। তুনাবী এতদিন আমেরিকায় ছিল ডাকাত স্বামীর ঘরে। সে এখন দুই সন্তানের জননী আর মুনাদ আগের মতোই গাঁজা খায়, কবিতা-টবিতা লিখে 'ক্লাসিক্যাল প্রেমিকের' ভং ধরেছে। টেলিফোনে তাদের কথোপকথন-

: তুনাবী, হোটেল শেরাটনে একটা রুম বুক করি?

: ছিঃ, কী বলছো মুনাদ? কোনো ভদ্রঘরের বউ হোটেলে রাত কাটায়?

: তাহলে লং ড্রাইভে বের হই?

: মুনাদ, এরশাদ আর হাসিনার লং ড্রাইভের বিষয়টা নিয়ে বিতর্কের পর এ ব্যাপারটার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।

: তাহলে?

: চলো,আগের দিনের মতো টিএসসিতে যাই।

: তুনাবী, ভয় লাগে খুব। হোটেলে রাত কাটালে কিংবা লং ড্রাইভে গেলে বড়জোর রাজনৈতিক বিতর্ক হবে। আর টিএসসিতে গেলে তোমাকে লোকজন বলবে কোনো ভালো ঘরের মেয়ে রাতের বেলায় টিএসসিতে যায়? তারপর যা ঘটতে পারে তাতে তুমি জ্ঞান হারাবে। আর আমি? মামুন কিংবা মুক্তার হয়ে বাঁধনের মতো তোমার উদ্ধারকারী হয়েও ফেঁসে যাই যদি!

উপহার

তুনাবী ও মুনাদের দেখা হয়েছিল। কখন, কোথায়, কীভাবে সেটা জানা খুব জরুরি নয়। তবে দেখা হওয়ার পর তাদের কথোপকথনগুলো শোনা যেতে পারে।

তুনাবী : একেবারে আগের মতোই আছো! শুধু কি কবিতাই লিখছো?

মুনাদ : না, কবিতার পাশাপাশি পত্রিকায় কলাম-টলামও লিখছি। কিন্তু তুমি বেনজির ভুট্টো স্টাইলে পোশাক বিশেষত ওড়না ব্যবহার করছো কেন?

তু : তাহলে শেখ হাসিনার মতো নেকাব পরব নাকি? আর তুমি কি টাইফাই পরার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে? জানো তো, বাবা বিশাল ব্যবসায়ী । ক্ষমতাসীনরা তাকে দাম দিয়ে চলে। কলাম-টলাম লিখছো যখন, বাবাকে বলে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কিংবা কোনো কালচারাল পোস্টে চাকরি নিয়ে দেই? অথবা বঙ্গবন্ধু ব্রিজের 'সিকিউরিটি কন্ট্রাক্ট'ও পাইয়ে দিতে পারি।

মু : কবিতা বা কলাম লিখি। ছড়া লিখি না। তবু তোমার উত্তরটা এই ছড়ার ভেতরে আছে। 'চাইনি তো প্লট উত্তরাতে, বঙ্গবন্ধু ব্রিজ/চাইছি শুধু বুকের ভেতর একটু জমিন লিজ!'

তু : তুমি আগের মতোই রয়ে গেলে! যদি লিজ নিতেই চাও তবে কোনো মন্ত্রী-ফন্ত্রী ধরে কোনো জলমহল, টিলা, পরিত্যক্ত সরকারি জমি বা শত্রু-সম্পত্তি লিজ নাও, দিনকাল ভালোই যাবে। তা না, বুকের ভেতর জমিন লিজ! আরে, বর্গা চাষীরে কেউ গোনে? মনে রাখে?

শহীদ

কেউ আত্মহত্যা করলে তাকে অনেকেই কাপুরুষ বলে। অথচ সজ্ঞানে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়াটা অনেক সাহসের কাজ বলেই মনে হয়। কিন্তু এমনভাবে মরে যাওয়ার পর তারা যেন কাপুরুষ হয়ে যায়।

রাশিয়ান একটা উপকথা আছে। 'প্রেমের পরিণতি মিলনাত্মক না হলে যখন কোনো জুটি আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তখন ওই প্রেমিক আত্মহন্তারক জুটিকে কেউ যেন কাপুরুষ না বলে। ওরা প্রেমের পথের মহান শহীদ!'

বন্ধুত্ব এবং প্রেম

রুশো আর অদিতি। তারা নিজেদের বন্ধু বলে পরিচয় দেয়। একদিন অদিতির দিকে অপলক চেয়ে থাকে রুশো। অদিতি বলে, 'ভিখিরির মতো তাকিয়ে কী দেখছিস?' রুশোর উত্তর, 'তোকে।' 'এভাবে কেন'—অদিতির এই প্রশ্নের উত্তরে রুশো জানায়, 'তোকে খুব করে আদর করতে ইচ্ছে করছে।' অদিতি মুহূর্তেই রেগে যায়। খুব ঝেড়ে চড় কষায় রুশোর গালে।

চড় খাওয়ার ঘটনাটা রুশোর বন্ধুমহলে জানাজানি হয়ে যায়। রুশো তার বন্ধুকে বলে, আচ্ছা ছেলে আর মেয়েদের বন্ধুত্বে সেটা থাকতেই পারে। অদিতিকে আমার ওই কথাটা বলা কি ভুল ছিল?

রুশোর বন্ধুটি অস্কার ওয়াইল্ডের একটি লেখা থেকে রেফারেন্স দিয়ে বলে, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে, শারীরিক সম্পর্ক কিংবা ঘনিষ্ঠতা হতে পারে। কিন্তু মেয়েরা কখনো ছেলেদের বন্ধু হয় না এ সমাজে।

রুশো কিছু বলতে পারে না। সে এক সময় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে ঘোরাঘুরি করতো। এক আড্ডায় তাকে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেছিলেন বন্ধুত্ব হচ্ছে একটা খেলার মাঠের মতো। যতোজন সম্ভব সেই মাঠে ঠাঁই দেওয়া যায়। কিন্তু প্রেম? সে তো হিমালয়ের চূঁড়ো। একজনেরই ঠাঁই হয় না কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার সেখানে ওঠা চাই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *প্রথম আলো* উপন্যাস পড়তে গিয়ে চমকে যায় রুশো। সুনীল লিখেছেন, প্রেম আর বন্ধুত্ব প্রায় কাছাকাছি। তফাৎ হচ্ছে প্রেমের দুটি ডানা থাকে বন্ধুত্বের তা থাকে না।

স্বপ্নের এই ডানার দেখা রুশো পায়নি। কী আর করা? অদিতির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলেও রুশো কিন্তু এখনো অদিতির 'কেমন কেমন' বন্ধুই থেকে গেল!

সংজ্ঞা ও সাধনা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন নিয়ে কেউ যদি গবেষণা করা শুরু করে সেটা নাকি কখনই শেষ হবে না। একইভাবে প্রেম বা ভালোবাসার সংজ্ঞা নিয়ে গবেষণা শুরু করলে তা শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। মান্না দে গাইবেন, প্রতিটা মানুষের জীবনে প্রেম আসে আর সুবীর নন্দী জানিয়ে দেবেন, পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই। মাঝখানে রবি ঠাকুরকেই আপনার মনে হবে—সখী ভালেবাসা কারে কয়?

তবু প্রেম ও ভালোবাসার বোধ যতটুকু প্রতিষ্ঠিত তা নাকি এমন—ভালোবাসা হচ্ছে ভালোলাগা বোধের এক তীব্র ঝাঁকুনি। এই 'ঝাঁকা নাকা ঝাঁকা নাকা' জেমসের গানের মতো ক্ষণস্থায়ী হলে সেটা মোহ। এই মোহ এসে যদি বসতে চায় আর আপনি যদি তাকে শুতে দিতে রাজি থাকেন তবে সেটা ভালোবাসা। আর এই ভালোবাসায় সাধনা যুক্ত হলে তাকে নাকি প্রেম বলে।

কারো কাছে এই সাধনা বলতে সারা রাত টেলিফোনে ফিসফিস করাও হতে পারে। অথবা হতে পারে রাত জেগে কম্পিউটারে 'চ্যাট' করা। রাজনীতির ভালোবাসায়

যেমন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত লং মার্চ কিংবা লাগাতার হরতাল (মাঝে মাঝে হরতাল নিছক অভিমানের পর্যায়ে পড়ে)।

তবে লাইলী-মজনুর প্রেমকাহিনী পড়লে এই সাধনার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। একদিন মজনু লাইলীকে খুঁজতে বেরিয়েছে। মুখে সে লাইলী, লাইলী রব তুলছে। এক মসজিদে সে সময় জিকির চলছিল। মসজিদের দরজা দিয়ে দৌড়ে এসে এক মুসল্লি তখন মজনুকে জোর করে থামায়। তারপর বলে, তুমি কেমন মানুষ হে? একটা মেয়েমানুষের নাম জপ করতে করতে ছুটে যাচ্ছ? ডেকেও থামানো যাচ্ছে না!

মজনুর উত্তর ছিল—আপনি তো বিধাতার নাম জপছিলেন। আমার লাইলী লাইলী রব আপনার কানে কীভাবে গেল?

একালের প্রেমিক

নিষ্পাপ থাকতে হলে নাকি উপাসনালয়ে যেতে হয়। পেতে হয় বিধাতার আশীর্বাদ। ধর্ম আমাদের যে বিধাতার সন্ধান দেয় তিনি থাকতে পারেন মনে, তবে তাকে আমরা দেখতে পাই না। বাস্তবে যে বিধাতাকে আমরা চোখ ভরে দেখতে চাই, তার নাম 'টাকা'। কাউকে কাউকে আশীর্বাদ দিয়ে এই টাকা বিধাতা কারো কারো পকেটে ক্যান্টনমেন্ট বানান। আর এই টাকা বিধাতার আধুনিক ঘর ব্যাংক হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপাসনালয়।

সুতরাং পকেটে যার টাকা বিধাতা, যিনি ব্যাংক নামের উপাসনালয়ের ইমাম তিনি-ই একালের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। বীর। যতো উপাধিতেই ভূষিত করা যাবে তিনি তাই।

যদি কেউ এমন হতে পারেন, তবে কারো কাছে যেতে হবে না, পৃথিবীর তাবৎ প্রেম-ভালবাসা আপনার পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি খাবে।

ক্ষমতাই সকল ভালোবাসার উৎস

ছেলেটি সামরিক বাহিনীতে চাকরি করত। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট থাকা অবস্থায় তার পরিচয় হয় মেয়েটির সঙ্গে। ছেলেটির জীবন বদলে যায়। ভাবে, মানুষ এত সুন্দর হয় আর এত সুন্দরভাবে ভালেবাসতে পারে অন্যজনকে!

ছেলেটি মেয়েটিকে দেয় বিয়ে করার নিশ্চয়তা। মেয়েটি জন্মদিন, পহেলা বৈশাখ, একুশের বইমেলা কিংবা থার্টি ফার্স্ট উৎসবে সবটুকু উচ্ছলতা তুলে রাখে ছেলেটির জন্য। ছেলেটি লেফটেন্যান্ট হয়। দিন কাটে একদিন তাদের বিয়ে হতে পারে, এই ভরসায়।

একদিন ছেলেটির চাকরি চলে যায় । মাত্র তিন মাস পরে মেয়েটি আসে তার বিয়ের কার্ড হাতে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে। বলে, তুমি দেবদাস হও, আমি সেটা কখনই চাই না। তুমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করো। আমি অন্যজনকে বিয়ে করছি। তুমি যদি একটি কথা মনে রাখ, তাহলে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে। কথাটি হচ্ছে মানুষের চেয়ে চেয়ার বড়, তোমার চেয়ে লেফটেন্যান্ট বড়!

ছেলেটি ঐ একদিনই কেঁদেছিল। আর কাঁদবে না জেদ ধরেছিল। তাই মাত্র আট বছর পর সে এখন একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। সে কারণে ক্ষমতা হারিয়ে নতুন করে ক্ষমতার ভালোবাসায় খালেদা জিয়া যখন গোলাম আযম কিংবা এরশাদের সঙ্গে এক টেবিলে ইফতারি করেন, তখন আর ছেলেটি অবাক হয় না। ভাবে, ক্ষমতার ভালোবাসা বলে কথা! একদিন শেখ হাসিনা এমন কাজ করেই তো আজ ক্ষমতার সাময়িক মালিক। নতুন আর একটা ব্যবসা খুলবে বলে ছেলেটি যখন একটু-আধটু ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তখন সে নিজেকে আর অদেশ প্রেমিক ভাবে না। কেউ যখন হিলারির ক্লিনটনকে না ছেড়ে যাওয়াটা কঠিন প্রেমের পরিচয় মনে করে তখন সে হাসে। ভাবে, ক্ষমতায় ক্লিনটন আছে বলেই হিলারি আজ এমন প্রেমিকা। ছয় বছরের কন্যা আর এক বছরের পুত্র নিয়ে এক মার্কেটে ঘুরতে থাকা সেই মেয়েটির সঙ্গে একদিন ওই ছেলেটির দেখাও হয়ে যায়। কিছুক্ষণ মার্কেটে ঘোরা, স্মৃতিচারণের পর নতুন মডেলের গাড়িতে ওঠার আগে মেয়েটি যখন ছেলেটিকে বলে 'আমার কথা কি তুমি আর এখন একটুও ভাব না ?' তখন ছেলেটি কাব্য করে বলে—

পিঠের ওপর ঘর বসতি,
পিঠের ওপর কাব্য,
আমার কথা ভাবব নাকি
তোমার কথা ভাবব?

রচনার সময়কাল নভেম্বর ১৯৯৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০০ সাল

সাহিত্য কেন্দ্র প্রকা...

POLITICS

"বেশি-বেশি বই পড়ুন
আলোকিত জীবন গড়ুন"

CONVERTED TO PDF

BY

---RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET